S@ifur's BCS

৩৬তম লিখিত

সংবিধান- ০২

- ☑ নির্বাহি বিভাগ
- ☑ আইন বিভাগ
- ☑ বিচার বিভাগ

- ❖ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
- ❖ সংশোধনীসমূহ
- ❖ সংবিধান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

মোঃ মাহফুজুর রহমান
SMS : 01613 43 20 65

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

BCS নিয়ে যে কোন পরামর্শ ও
অভিনন্দন দিয়ে Comment/Like করুন-
www.facebook.com/groups/saifurs.bcs.achievement

০৩

Scanned by CamScanner

BCS Syllabus on Bangladesh Affairs

❖ **Organs of the Government:**

a) **Legislature :** Representation, Law-making, Financial and Oversight functions; Rules of Procedure, Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat.

b) **Executive :** Chief and Real executive e.g., President and Prime Minister, Powers and Functions; Cabinet, Council of Ministers, Rules of Business, Bureaucracy, Secretariat, Law enforcing agencies; Administrative setup- National and Local Government structures, Decentralization Programmes and Local Level Planning.

c) **Judiciary :** Structure: Supreme, High and other Subordinate Courts, Organization, Powers and functions of the Supreme Court, Appointment, Tenure and Removal of Judges, Organization of Sub-ordinate Courts, Separation of Judiciary from the Executive, Judicial Review, Adjudication, Gram Adalat, Alternative Dispute Resolution (ADR).

BCS প্রশ্নাবলী | বিগত সালের প্রশ্নাবলী

☑ বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ ধারায় আপনি কী ধরনের সংস্কার প্রস্তাব করবেন? (৩৫তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর পাঁচটি দিক উল্লেখ করুন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ সংসদীয় সরকার কিভাবে গঠিত হয়? (৩৫তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশে ন্যায়পালের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ এটর্নি জেনারেলের কাজ কি কি ? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক ক্ষমতার একটি বিবরণ দিন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশের আইন পরিষদের গঠন সম্পর্কে লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় **Rules of Procedure**-এর গুরুত্ব সংক্ষেপে লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের গঠন সম্পর্কে লিখুন। (৩৫তম বিসিএস)

☑ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নিম্নের যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন ঃ- (৩৪তম বিসিএস)

ক) সংবিধান রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কিত বিধান কি?

খ) সংবিধানের প্রাধান্য বলতে কি বোঝায় তা অনুচ্ছেদ উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করুন।

গ) সংবিধানের রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসাবে নাগরিকদের জন্য কি কি বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?

ঘ) চলাফেরার ও সমাবেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত সংবিধানের বিধানদ্বয় কি কি এবং তা কোন কোন অনুচ্ছেদে রয়েছে?

ঙ) জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা উল্লেখ করুন।

☑ সংবিধান কি? বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ৪টি নীতি কি কি? বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে? মহামান্য রাষ্ট্রপতি কাদেরকে শপথ বাক্য পাঠ করান? মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে কোন কোন সংস্থার প্রধান? (৩৩তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন। এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার প্রয়োজন কতটুকু বলে আপনি মনে করেন? (২৯তম বিসিএস)

☑ "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অতিমাত্রায় ক্ষমতার অধিকারী"– এ উক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে আপনার বক্তব্য উপস্থাপন করুন। (৩২তম বিসিএস)

☑ মন্ত্রিসভা গঠন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান উল্লেখ করুন। (৩১তম বিসিএস)

☑ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে বর্ণনা দিন। (৩১তম বিসিএস)

☑ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসমূহ কী কী? সংসদ সদস্যের আসন কেন এবং কখন শূন্য ঘোষণা করা যায়? (৩১তম বিসিএস)

☑ সংবিধান অনুযায়ী অর্থ বিল কোন বিষয়াবলি সম্বলিত থাকে? কোন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এর সার্বিক অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। (২৯তম বিসিএস)

Scanned by CamScanner

Teacher Work — সংবিধান- 02

- নির্বাহী বিভাগ
- আইন বিভাগ
- বিচার বিভাগ

Student Work — নির্বাহী বিভাগ

মহান স্বাধীনতা ও গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, আমাদের স্বপ্নের দেশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। গৌরবময় বাংলাদেশ কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। যাকে বাংলাদেশের সংবিধান বলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান স্তম্ভ রয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থা সুচারুভাবে পরিচালিত হয়।

স্তম্ভ তিনটি হল-

i. Executive (নির্বাহী বিভাগ)
ii. Legislative (আইন বিভাগ)
iii. Judiciary (বিচার বিভাগ)

নির্বাহী বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রধান এবং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি সাংবিধানিকভাবে এবং আইনবলে তাঁর উপর অর্পিত সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং দায়িত্ব পালন করেন। সরকারের যাবতীয় নির্বাহী কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদান করা হয়। সাংবিধানিকভাবে সকলের উর্ধ্বে থাকলেও রাষ্ট্রপতি বাস্তবে নামমাত্র প্রধান নির্বাহী হিসাবে শুধু আনুষ্ঠানিক কার্যাদি সম্পাদন করেন এবং দায়িত্ব পালন করেন। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা নির্বাহ করে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রপতি

- **রাষ্ট্রপতিঃ** রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান। সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪৮-৫৪ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি সংক্রান্ত বিধানসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন এবং সংবিধান ও অন্য যে কোন আইনের দ্বারা তাঁকে প্রদত্ত ও তাঁর উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন।

- **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ঃ** রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হত। ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। ফলে পরোক্ষ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান করা হয়। বর্তমানে সংবিধানের ৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান প্রচলিত করা হয়েছে।

- **রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানে সরাসরি রাষ্ট্রপতি হবার কি কি যোগ্যতা থাকা উচিৎ সে বর্ণনা নেই। তবে ৪৮ (৪) অনুচ্ছেদে কোন ব্যক্তি কি কি কারণে রাষ্ট্রপতি হবার যোগ্য হবেন না, সে বর্ণনা রয়েছে। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হবার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি-
  - ক) পঁয়ত্রিশ বছরের কম বয়স্ক হন; অথবা
  - খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য না হন; অথবা
  - গ) কখনও সংবিধানের অধীনে অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হয়ে থাকেন।

- **রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ ঃ** সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বছর মেয়াদে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। তবে শর্ত হচ্ছে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া কোন ব্যক্তি দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

Scanned by CamScanner

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ বা অসামর্থ্য ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ কখনও রাষ্ট্রপতিবিহীন থাকতে পারবে না। রাষ্ট্রপতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে চাইলে, স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয়পদ ত্যাগ করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি শারীরিক বা মানসিকভাবে অসামর্থ্য হলে সংসদের মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে লিখিত প্রস্তাব স্পীকারের নিকট পেশ করে প্রস্তাব সংসদে পাস করার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা যায়। রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসামর্থ্য বা অন্য কোন কারণে অবর্তমান থাকাকালে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন ঃ সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে সংসদ সদস্যের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অভিযোগের বিবরণ সম্বলিত একটি প্রস্তাব স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হয়। স্পীকার সংবিধানে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি অভিশংসনের প্রস্তাবটি সংসদে প্রেরণ করবেন। অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করলে, প্রস্তাব গৃহীত হবার তারিখ হতে রাষ্ট্রপতি অভিশংসিত হবেন বা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর প্রধান উৎস হল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। এছাড়া দেশে প্রচলিত ও বিদ্যমান কার্যাবলি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির একটি সচিবালয় আছে যা 'রাষ্ট্রপতির কার্যালয়' হিসাবে পরিচিত। রাষ্ট্রপতিকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে দুটি বিভাগ রয়েছে। যথা ঃ

ক) সরকারি বিভাগ।
খ) ব্যক্তিগত বিভাগ বা আপন বিভাগ।

১) **সরকারি বিভাগ ঃ** সরকারি বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন রাষ্ট্রপতির মূখ্য সচিব। এই বিভাগ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে সাংবিধানিক, আইনগত ও নির্বাহী দায়িত্ব পালনে দাপ্তরিক সহায়তা প্রদান করে।

২) **ব্যক্তিগত বা আপন বিভাগ ঃ** এই বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত সচিব। এই বিভাগ বঙ্গভবন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম, অন্যদেশীয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে। এছাড়াও রাষ্ট্রপতির কাজ সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রপতির আরও কয়েকজন সচিব থাকেন। যেমন ঃ রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব প্রভৃতি।
'রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে মূলত ঃ পাঁচটি শ্রেনীতে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

ক) **নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ** রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারের যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। তাঁর নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

১) রাষ্ট্রপতি আইন করে তার নামে প্রণীত আদেশ, অধ্যাদেশ,প্রজ্ঞাপন প্রভৃতি জারি করেন।
২) রাষ্ট্রপতি সরকারের কার্যক্রম বন্টন এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বিবিধ বিধি ও উপবিধিসমূহ প্রণয়ন করেন।
৩) রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় অধিকাংশ সংসদ-সদস্যের সমর্থন লাভে সক্ষম একজন সংসদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।
৪) রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের মধ্য হতে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন বিচারককে প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ প্রদান করেন।
৫) তিনি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের নিয়োগ প্রদান করেন।
৬) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।
৭) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণকে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারগণকে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের, বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রভৃতি পদের নিয়োগ প্রদান করেন।

খ) **বিধানিক ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ** নির্বাহী ক্ষমতা ছাড়াও রাষ্ট্রপতির উল্লেখযোগ্য বিধানিক ক্ষমতা রয়েছে। তাঁর বিধানিক ক্ষমতাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন আহবান, স্থগিতকরণ বা সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। সংসদে ভাষণ প্রদান এবং বাণী প্রদানের অধিকার রাষ্ট্রপতির রয়েছে।
২) সংসদ অধিবেশন চালু না থাকলে কিংবা কোন কারণে সংসদ ভঙ্গ হলে জরুরী প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং এই সমস্ত আইন সংসদে পাস করা আইনের মতই কার্যকর হয়।
৩) সংসদে গৃহীত প্রতিটি বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। রাষ্ট্রপতি কোন বিলে সম্মতি দিলে অর্থাৎ স্বাক্ষর করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

গ) **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ** সংবিধানের ৪৯ এবং ৫১ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি সকল বিচারের উর্ধ্বে অবস্থান করেন। তার বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১) রাষ্ট্রপতি কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত যে কোন প্রকার দণ্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করতে পারবেন।
২) রাষ্ট্রপতি যে কোন প্রকার বিচারের দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করতে পারবেন।
৩) রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যের জন্য কোন আদালতে কোন প্রকার জবাবদিহি করবেন না কিংবা তাঁর কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে কোন প্রকার মামলা দায়ের করা যাবে না।

Scanned by CamScanner

ঘ) **আর্থিক ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ** রাষ্ট্রপতির আর্থিক সংক্রান্ত প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে। তার আর্থিক ক্ষমতা নিম্নরূপঃ

১) অর্থবিল বা সরকারি ব্যয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন প্রকার বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া সংসদে পেশ করা যাবে না।

২) যে কোন প্রকার সরকারি সাহায্য বা অনুদান রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর কার্যকর হবে।

৩) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর হতে কার্যকর হয়।

৪) সম্পুরক বা অতিরিক্ত মঞ্জুরী সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির রয়েছে।

ঙ) **অন্যান্য ক্ষমতা ও কার্যাবলি ঃ** উল্লিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলি ছাড়াও রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন পদের শপথ গ্রহণ, বিদেশী অতিথিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎসহ প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। যেমন ঃ

১) প্রধান বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারকে সংবিধানের তৃতীয় তফসিল অনুসারে রাষ্ট্রপতি শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন।

২) রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ অথবা তাঁদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেন।

৩) রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রেরণ ও গ্রহণ করেন।

৪) বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পাদিত যাবতীয় চুক্তি, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর বার্ষিক প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি এগুলো সংসদে প্রেরণ করেন।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যবলি অনেকটাই প্রতীকস্বরূপ হলেও সুষ্ঠ, নিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক চর্চায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূণ।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীই কার্যত প্রধান শাসক এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনী আইন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী 'কেবিনেট স্থাপত্যের প্রধান প্রস্তর' হিসেবে গণ্য হন। কেননা, কেবিনেট তথা মন্ত্রিপরিষদের সাফল্য এবং ব্যর্থতা প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। নিচে বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হলো ঃ

১) **সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী ঃ** সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী অনুযায়ী যাবতীয় নির্বাহী সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। রাষ্ট্রপতি শুধু নামসর্বস্ব প্রধান হিসেবে থাকবেন। তিনি সকল ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। উচ্চ পদে নিয়োগ, পররাষ্ট্র বিষয়ক ও যাবতীয় অর্থ সংক্রান্ত কার্যাদি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই পরিচালিত হয়।

২) **সংসদে নেতৃত্ব দান ঃ** প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। তিনি একজন সদস্যও। তার পরামর্শে প্রেসিডেন্ট সংসদের অধিবেশন আহবান ও স্থগিত করেন। তার পরামর্শে সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। তার সাথে পরামর্শ করে স্পিকার সংসদ অধিবেশনের কর্মসূচী নির্ধারণ করেন। সংসদে তিনি সরকারের মুখপাত্র হিসেবে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিল ও সরকারি নীতির ব্যাখ্যা দেন। তাঁর নির্দেশমতো দলীয় হুইপ সংসদে দলীয় সদস্যগণকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ অথবা রাষ্ট্রপতিকে সংসদ ভেঙে দেয়ার পরামর্শ প্রদানের মধ্যে যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেত পারেন। মূলত তিনিই সংসদের প্রধান নিয়ন্ত্রক।

৩) **মন্ত্রিসভার সর্বেসর্বা ঃ** প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রিপরিষদের প্রধান এবং সর্বেসর্বা। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিপরিষদ গঠিত। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তার স্থায়িত্বের ওপর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তিনি পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

৪) **নির্বাহী কর্তা ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সকল নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে পরিচালিত হয়। কিন্তু এর বাস্তব প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত সকল কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমতো সম্পাদন করবেন। প্রধানমন্ত্রী নিজে মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মাধ্যমে কিংবা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, আইনে সম্মতিদান, অধ্যাদেশ জারি, দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস ইত্যাদি সকল কাজে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

৫) **আইনসভার প্রধান ঃ** সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও মুলতবি রাখতে হয়। সংসদের কর্মসূচি প্রণয়নে সংসদ নেতা হিসেবে তার ভূমিকাই প্রধান।

Scanned by CamScanner

৬) **আইন প্রণয়নে ভূমিকা ঃ** সংসদ নেতা হিসেবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংসদে উত্থাপিত কোনো বিল সংসদে পাস না হলে সংসদের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ বা মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেয়ার পরামর্শ দিতে পারেন।

৭) **অর্থনৈতিক কার্যাবলি ঃ** জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের অভিভাবক। প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রীকে বাজেট প্রণয়নের ব্যবস্থা ও তা সংসদে পেশ করার নির্দেশ দেন। তাছাড়া প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে সংসদ অর্থ মঞ্জুরি দিতে অসমর্থ হলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ষাট দিনের জন্য অর্থ মঞ্জুরি দিতে পারেন।

৮) **জাতীয় নিরাপত্তা এবং সংহতির প্রতীক ঃ** প্রধানমন্ত্রী জাতীয় নিরাপত্তা এবং জাতীয় সংহতির প্রতীক। জাতীয় প্রতিরক্ষা তার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সংকটকালে সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষা দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে আসে। এ সময় জাতীয় নিরাপত্তা এবং রাষ্ট্রের সংহতির জন্য তিনি সম্ভাব্য সবকিছু করতে পারেন।

৯) **জরুরি অবস্থায় ঃ** দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। জরুরি অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদকে পর্যন্ত এড়িয়ে যেতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে পারেন।

১০) **রাজনৈতিক দলের নেতা ঃ** ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী। এ দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার ফলেই তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আবার সরকারি নীতি ও কর্মসূচি নিজ দলকে অবহিত করে সে ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে প্রচার ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দলকে নির্দেশ দেন। সংসদে তার দলীয় সদস্যগণ তাঁর নির্দেশমতো ভূমিকা পালন করেন। সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদ সংসদে নিজ দলীয় সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে প্রভূত ক্ষমতা দান করেছে। তার ভাবমূর্তিই দলের ইমেজ বৃদ্ধি ও ক্ষুণ্ন করার প্রধান মাপকাঠি।

১১) **জাতীয় নেতা ঃ** জাতীয় নেতার ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রীর স্থান সবার উর্ধ্বে। জাতীয় সংসদের প্রধান নেতা হিসেবে তিনি বহির্বিশ্বেও প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বিবৃতি ও বক্তৃতা দানের মাধ্যমে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১২) **পররাষ্ট্রনীতির প্রধান নির্ধারক ঃ** প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্র বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। তার সম্মতি ব্যতীত কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনিই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন।

১৩) **পদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগদান ঃ** তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, বিচারক, রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি নিয়োগ করতে পারলেও কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমেই নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

১৪) **সেতুবন্ধনস্বরূপ ঃ** প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিপরিষদের মধ্যে সেতুবন্ধনস্বরূপ। সংবিধানের ৪৮ (৫) ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তসমূহ রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন এবং রাষ্ট্রপতির উত্থাপিত কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য তিনি তা মন্ত্রিসভায় আলোচনা করেন।

১৫) **সংসদীয় কমিটি গঠন ঃ** সংসদীয় সরকারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব কমিটির ভূমিকা যথাযথ পালিত না হওয়ার ওপরে সরকারের সাফল্য/ব্যর্থতা নির্ভর করে। প্রধানমন্ত্রী এসব কমিটির সদস্যপদে তার দলীয় সংসদ সদস্যদের মনোনীত করেন।

১৬) **জনমতের নিয়ামক ঃ** প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলি দেশের জনমতের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত সংসদে তাঁর বিবৃতি ও বক্তব্য বিরোধী দল ও সরকারি দলের সদস্যদের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছায়। জনগণ এসবের ওপর যে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে তা সরকারি সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রমকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। অতএব প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, ভাবমূর্তি, জনসংযোগ ইত্যাদি সরকারকে কার্যকর ভূমিকা পালনে সহায়তা করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, দ্বাদশ সংশোধনী আইনে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রীপরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থার মূল ব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভার গঠন, স্থায়িত্ব, উত্থান, পতন আবর্তিত। তাই বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রের কর্ণধার বলা হয়।

Scanned by CamScanner

আইন বিভাগ (Legislative)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের পঞ্চমভাগে আইন সভার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের আইন সভা 'জাতীয় সংসদ' নামে অভিহিত এবং প্রজাতন্ত্রের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত। বাংলাদেশের আইন-সভা এক-কক্ষবিশিষ্ট এবং রাজধানী ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনে সংসদের স্থায়ী আসন রয়েছে। একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে সংসদ গঠিত হয় এবং সদস্যগণ সংসদ-সদস্য হিসেবে অভিহিত হন। ওয়ারেন্ট অব প্রেসিডেন্স (Warrent of Precedence) বা পদ-মর্যাদার ক্রমে সংসদ সদস্যগণ সচিবদের উপরে অবস্থান করেন।

জাতীয় সংসদ

আইনের শাসন, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, নিয়মিত নির্বাচন, শক্তিশালী রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের চর্চাকে গতিশীল করতে এবং গণতন্ত্রের সুফল লাভ করতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হল আদর্শ ব্যবস্থা। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের আস্থাভাজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সরকার গঠন করে দেশ পরিচালনা করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বিরোধী দল হিসাবে সংসদে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। জাতীয় সংসদ হল সকল আলাপ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-কানুন প্রণয়ন করা হয়, দেশে বিদ্যমান সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

জাতীয় সংসদের গঠন

একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা হতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী ৩০০ জন নির্বাচিত সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত। সংরক্ষিত ৫০টি মহিলা আসন সহ বর্তমানে জাতীয় সংসদ ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। নির্বাচিত সংসদ সদস্যের আসন সংখ্যার অনুপাতে রাজনৈতিক দল হতে সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

সংসদের কার্যকাল ৫বছর অর্থাৎ প্রতি ৫ বছর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হবে এবং পরিচালিত হবে। তবে সংবিধিবদ্ধ কারণে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার আগেই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যের মধ্য হতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করেন এবং তাঁরা সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করেন।

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

জাতীয় সংসদ সদস্যের মূল দায়িত্ব হল, দেশের জন্য উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা। এছাড়াও নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ, বাজেট পাশ, সংবিধান সংশোধনসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। বর্তমান সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ। জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে নিম্নোক্ত ১১ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ।
২) অর্থ বিল সংক্রান্ত কাজ।
৩) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কাজ।
৪) নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ।
৫) বিচার বিভাগীয় কাজ।
৬) সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ।
৭) সংসদের স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কাজ।
৮) কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম সংক্রান্ত কাজ।
৯) নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ।
১০) সংবিধান সংশোধন।
১১) বিবিধ কার্যাবলি।

Scanned by CamScanner

১) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ ঃ** বাংলাদেশ সংবিধানে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকবে এবং সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত থাকবে"।

সংসদ আইনের দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রতিবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতা সম্পূর্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে। আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হবে। সংসদ কর্তৃক কোন বিল পাস হবার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে আইনে পরিণত হবে।

২) **অর্থ বিল সংক্রান্ত কাজ ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যাবতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রক অভিভাবক হল জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৮৩ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে "সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না"। সরকার কর্তৃক কোন ঋণগ্রহণ বা গ্যারান্টিদান প্রভৃতি অর্থ বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত।

৩) **বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্রান্ত কাজ ঃ** প্রত্যেক অর্থ-বৎসর অর্থাৎ জুলাই মাসের প্রথম তারিখ হতে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সংক্ষেপে বাজেট জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত হবে। সংসদ সদস্যদের আলোচনা, প্রস্তাব ও সংশোধনী সাপেক্ষে এই বাজেট জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পাস হয় এবং কার্যকর হয়।

৪) **নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ ঃ** জাতীয় সংসদ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সম্পর্কিত দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদের ৫০ জন মহিলা সদস্য নির্বাচন সংসদে অবস্থানরত বিভিন্ন দলের আসন সংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত হন। এছাড়া সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

৫) **বিচার বিভাগীয় কাজ ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিচার সংক্রান্ত কাজ মূলতঃ বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত হলেও জাতীয় সংসদ কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজ করে থাকে। সংবিধানের কোন ধারা লঙ্ঘন, গুরুতর অপরাধ বা অসদাচরণ, দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে জাতীয় সংসদ, সংসদ সদস্যের ২/৩ অংশ ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অভিসংশন (Impeachment) করতে পারেন। আবার জাতীয় সংসদ ন্যায়পালকেও অনুরূপ অভিযোগের কারণে অপসারণ করতে পারেন।

৬) **সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ ঃ** সরকারী অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে অর্থ প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে অর্থ প্রদান বা তা হতে অর্থ প্রত্যাহার এবং সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক অর্থের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিষয় সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হবে।

৭) **সংসদের স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কাজ ঃ** সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে সদস্য নিয়ে সরকারী হিসাব কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি, সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করা হয়। এ সকল স্থায়ী কমিটি খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করতে পারেন। জনগুরুত্ব সম্পন্ন কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্পর্কে অনুসন্ধান বা তদন্ত করতে পারেন এসব স্থায়ী কমিটি।

৮) **কার্যপ্রণালী বিধি, কোরাম সংক্রান্ত কাজ ঃ** সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালীবিধি দ্বারা জাতীয় সংসদ পরিচালিত হয়। উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ষাটের কম হলে কোরাম সংকট দেখা দেয় এবং কমপক্ষে ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন স্থগিত বা মূলতবি থাকে।

৯) **নির্বাহী বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ ঃ** বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাতীয় সংসদ নির্বাহী বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন সদস্য প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রজাতন্ত্রের যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং মন্ত্রীসভা একক ও যৌথভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকে। সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। তবে সংসদে সরকারী দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে মন্ত্রীসভা সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১০) **সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কাজ ঃ** সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় সংসদ সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করতে পারবে। তবে সংশোধনী প্রস্তাব পাশের জন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হতে হবে।

১১) **বিবিধ কার্যাবলি ঃ** যুদ্ধ ঘোষণা ও জন নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা সুপ্রিমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য আদালত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের বিচারের জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ক্ষমতা সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, সংসদ সদস্য প্রভৃতি অলাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত ব্যক্তির সম্মানী, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্ত সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকর আইন প্রণয়নের কাজ মহান সংবিধানের উপর ন্যস্ত। সংসদে প্রণীত আইন সবচেয়ে শক্তিশালী এবং এটা সমগ্র দেশের জন্য কার্যকর। জাতীয় সংসদ গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা রাখবে এটাই বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যাশা।

Scanned by CamScanner

সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৬নং অনুচ্ছেদে সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত রয়েছে ।

সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা ঃ

১) বাংলাদেশী নাগরিক হতে হবে।

২) বয়স কমপক্ষে পঁচিশ বছর পূর্ণ হতে হবে।

সংসদ সদস্য হবার এবং থাকার অযোগ্যতা ঃ

১) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হলে।

২) দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যহতি লাভ না করলে।

৩) কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করলে।

৪) নৈতিক স্থলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অনুর্দ্ধ দুই বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে এবং মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত না হলে।

জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

সংবিধানের ৮০ নং অনুচ্ছেদে আইন প্রণয়ন পদ্ধতির নিম্নরূপ বর্ণনা রয়েছে –

আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল-আকারে উত্থাপিত হবে। আনীত বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে সম্মতির জন্য সেটি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করার পর পনের দিনের মধ্যে সে তাতে সম্মতিদান করবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করে একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তা করতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তা পুনর্বিবেচনা করবে; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে সে বিলটিতে সম্মতিদান করবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তা করিতে অসমর্থ হলে উক্ত মেয়াদের অবসানে সে বিলটিতে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হবে। সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করলে বা সে সম্মতিদান করেছেন বলে গণ্য হলে তা আইনে পরিণত হবে এবং সংসদের আইন হিসেবে অভিহিত হবে।

অর্থবিল- প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

অর্থবিল

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান দ্বারা সদ্য স্বাধীন দেশ পরিচালনা করা হয়। পরবর্তী দীর্ঘ এক বছরের মাথায় একটি সংবিধান তৈরি করা হয়, যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে কার্যকর হয়। এই সংবিধান হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এ সংবিধান ১১ বিভাগে বিভক্ত এবং ১৫৩ অনুচ্ছেদ সম্বলিত। সংবিধানের পঞ্চম ভাগের ২য় পরিচ্ছেদে 'আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি' শিরোনামে ৮১ নং অনুচ্ছেদে অর্থবিল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংবিধানের ৮১ নং অনুচ্ছেদের দফা (১)-এ বলা হয়েছে, 'অর্থবিল' বলতে কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি সম্পর্কিত বিধানাবলী-সংবলিত বিল বুঝাইবে ঃ

ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;

খ) সরকার কর্তৃক ঋণ গ্রহণ বা কোন গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত আইন সংশোধন;

গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুরূপ তহবিলে অর্থ প্রদান বা অনুরূপ তহবিল হতে অর্থদান বা নির্দিষ্টকরণ;

ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুরূপ কোন দায় রদবদল বা বিলোপ;

ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুরূপ অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;

চ) উপরিউক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের অধীন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়।

দফা (২)-এ বলা হয়েছে, 'কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদন্ড আরোপ বা রদবদল, কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোন কার্যের জন্য ফি বা উসুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হইয়াছে, কেবল এই কারণে কোন বিল অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে না'।

Scanned by CamScanner

অর্থবিল প্রণয়ন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া

অর্থমন্ত্রী বা অর্থ মন্ত্রণালয় এটা প্রণয়ন করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮১ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট পেশ করার সময় প্রত্যেক অর্থবিলে স্পিকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে একটি সার্টির্ফিকেট থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল এবং অনুরূপ সার্টির্ফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।'

বাংলাদেশ সংবিধানের ৮১ (৩) দফায় অর্থবিল নিরূপনের ক্ষেত্রে স্পিকারের সার্টির্ফিকেটই চূড়ান্ত বলে গণ্য। সেক্ষেত্রে স্পিকারের সার্টির্ফিকেট নিয়ে আদালতে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। ৭৮ নং অনুচ্ছেদের (১) দফা বলে যে, 'সংসদের কার্যধারার বৈধতা নিয়ে আদালতে কোন প্রশ্ন তোলা যাইবে না।' এ কারণে অর্থবিল নয়- এমন বিলের ওপর অর্থবিলের রং চড়ালেও আদালত প্রতিকার দিতে পারবে না। অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে তাতে সম্মতি দেবেন এবং না দিলেও মেয়াদ শেষে তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে।

Student Work [redacted] বিচার বিভাগ [redacted]

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা রক্ষার উপায় ঃ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ বা অন্যান্য শক্তির হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত হয়ে বিচার বিভাগ কর্তৃক নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য সমাধানকেই বুঝায়। বিচারকগণ কেবল আইনের অধীন হবেন আর কারো অধীন হবেন না এমন হলে তারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ থেকে মুক্ত থেকে বিচারকার্য সমাধা করতে পারবেন। যা একটি দেশ ও জাতির জন্য অত্যাবশ্যক। আর এ থেকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। পঞ্চম তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৮ সনে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বাংলাদেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ যাত্রা শুরু করে ১ নভেম্বর ২০০৭। সাব জজ মোহাম্মদ মাজদার হোসেন ও ৪৪০ জন বিচারক ১৯ নভেম্বর ১৯৯৪ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় ঃ

কোন ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কোন বিভাগের হস্তক্ষেপ ছাড়া বিচারবিভাগের কাজ করার ক্ষমতাকে ঐ বিভাগের স্বাধীনতা বলে। অর্থাৎ, বিচার প্রক্রিয়া, বিচারকদের নিয়োগ, বেতন দেয়া ও কার্যাবলী নির্ধারণের জন্য বিধান তৈরীসহ সকল কাজ করার জন্য বিচারবিভাগের স্বাধীন ক্ষমতা থাকতে হবে।

'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা'-এই ধারণাটির উৎস হল ক্ষমতা বিভক্তিকরণ নীতি। পৃথিবীর সকল দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তিনটি বিভাগ রয়েছে- নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগ। এক্ষেত্রে এই তিনটি বিভাগের মধ্যে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ক্ষমতার সঠিক বণ্টন এবং প্রতিটি বিভাগ যেন ক্ষমতার অপব্যবহার না করে তা তত্ত্বাবধান করাই এই ক্ষমতা বিভক্তিকরণ নীতির মৌলিক তত্ত্ব। এই ক্ষমতা বিভক্তিকরণ নীতির সফলতার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রয়োজন। বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থাকে যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ নেই তাহলে দেখা যায় এদেশের নির্বাহী ও আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলই সরকার গঠন করে। তাই আইনসভার কাজে মন্ত্রীপরিষদের বা নির্বাহী বিভাগের কাজে আইনসভার হস্তক্ষেপ যেন না থাকে তা তত্ত্বাবধান করা বিচারবিভাগের দায়িত্ব। সেজন্য বিচার বিভাগকে অন্য সকল বিভাগ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে।

সংবিধান ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ

আমাদের সংবিধান অনুযায়ী বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি মূলনীতি। অর্থাৎ, সরকারের কাজ কর্মে সংসদের আইন প্রণয়নের সময় এই নীতির প্রতিফলন ঘটাতে হবে। আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সুপ্রীম কোর্টের সকল বিচারপতি বিচারের কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন। একইরকমভাবে বলা হয়েছে, বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারের কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন। আর শুধু তা-ই নয় 'স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ আদালতে বা ট্রাইব্যুনালে ফৌজদারী বিচারলাভের মৌলিক অধিকার রয়েছে দেশের সকল নাগরিকের।

এছাড়া বিচার বিভাগের কিছু ক্ষমতা যেমন- কোন আইন সংবিধান পরিপন্থী হলে তা অবৈধ ঘোষণা করা, কোন ব্যক্তি বা সরকার যদি কারও মৌলিক অধিকার খর্ব করে তবে লংঘিত অধিকার বলবৎ করা, কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যদি নিজ দায়িত্ব পালন করতে না চায় তবে তাকে ঐ কাজ করতে বাধ্য করা ইত্যাদি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অংশ। এছাড়া সুপ্রীম কোর্ট আদালতের বিচার প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য যে কোন আদেশ দিতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের আদেশ মানা সবার জন্য অর্থাৎ, অধস্তন আদালতসহ নির্বাহী ও বিচারবিভাগের জন্যও বাধ্যতামূলক। সুতরাং, এই সকল বিধান আমাদের শাসন ব্যবস্থায় বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতার উপস্থিতি নিশ্চিত করে।

Scanned by CamScanner

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব ঃ

নিম্নে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

০১. **সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ঃ** উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সমাজব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।

০২. **শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন ঃ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতার জন্য অপরিহার্য। কোনো শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারব্যবস্থার কর্মকুশলতা অপেক্ষা যোগ্যতম মানদণ্ড আর নেই।

০৩. **গণতন্ত্রের সফলতা ঃ** কোনো রাষ্ট্রে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য যে সকল শর্ত পূরণ করতে হয়, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কেননা ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণ, আইন ভঙ্গকারীর শাস্তিবিধান, সংবিধানের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিচার বিভাগ সম্পাদন করে থাকে।

০৪. **মৌলিক অধিকার রক্ষা ঃ** সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন কারো মৌলিক অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে না পারে সেজন্য বিচার বিভাগ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

০৫. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও স্বেচ্ছাচার রোধ ঃ** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা বিচারকের পবিত্র দায়িত্ব। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যতীত নাগরিক অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতাকে রোধ করতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক।

০৬. **স্বাধীনতা রক্ষা ঃ** রাষ্ট্রে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। নির্ভীক, নিরপেক্ষ এবং সৎ ও অভিজ্ঞ বিচারপতিরাই সংকীর্ণ ব্যক্তি বা শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেন।

০৭. **শাসন বিভাগের অভিভাবক ঃ** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগের অভিভাবক। বিচার বিভাগের নির্দেশিত পথে শাসন বিভাগকে পরিচালিত করতে না পারলে নাগরিক স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

০৮. **সুসভ্য সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠা ঃ** বিচার বিভাগের স্বাধীন অস্তিত্ব ছাড়া সুসভ্য সামাজিক জীবন কল্পনা করা যায় না। সমাজজীবনে সম্ভাব্য সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রধান শক্তিই হলো স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আছে বলেই একটি দেশের সরকার সংবিধান নির্দেশিত পথে চলতে বাধ্য হয় এবং স্বৈরাচারী হতে পারে না।

০৯. **দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ঃ** বিচার বিভাগ শুধু প্রচলিত আইন প্রয়োগ করে অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে না বরং আইনের যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আইনের ত্রুটি দূর করে এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি সুবিচার করে। এরূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই বিচার বিভাগের মূল লক্ষ্য।

১০. **সংবিধান রক্ষা করা ঃ** সংবিধান রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম। বিচার বিভাগ সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকলে সংবিধান রক্ষা করা সম্ভব নয়।

১১. **ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা ঃ** ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপিরিসীম। বিচার বিভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে কাজ, কর্ম, চলাফেরা ইত্যাদি করতে পারে সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২. **বিরোধ নিস্পত্তি ঃ** আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা ধরনের বিরোধ দেখা দেয়, এসব বিরোধ নিস্পত্তির জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিহার্য। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা থাকলে সাংবিধানিক উপায়ে বিচার বিভাগ ঐ সমস্ত কাজ সমাধান করতে পারে।

১৩. **তদন্তমূলক কাজ সম্পাদন ঃ** তদন্তমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোনো মারাত্মক সমস্যার উদ্ভব হলে বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ তদন্ত করে সরকারকে সহযোগিতা করে থাকে। নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন।

১৪. **ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ঃ** ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য। বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন না হয় কিংবা বিচারকরা যদি অন্যান্য বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে তাদের দ্বারা ন্যায়বিচার আশা করা যায় না। তাই ন্যায়বিচার পাবার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিসীম।

১৫. **সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ঃ** বিচার বিভাগকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা বলা হয়। দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত বিভিন্ন বিষয় বিচার বিভাগ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। আর এসব বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব বিভাগের স্বাধীনতা থাকলে।

Scanned by CamScanner

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ-

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপায়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

০১. **যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগ ঃ** বিচারকগণের যোগ্যতা বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম মাপকাঠি। যোগ্য বিচারকগণই স্বাধীন ও সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করতে পারেন। আইনজ্ঞ, সৎসাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কহীন ব্যক্তিগণকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে। কেননা অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, দলীয় ব্যক্তিদের বিচারক নিয়োগ করলে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না।

০২. **বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি ঃ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকাংশে বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। আইন পরিষদ কর্তৃক বিচারক নিয়োগ করা হলে দলীয় সদস্য বা দলীয় সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণেরই বিচারক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে বিচারকদের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হতে পারে। জনগণ কর্তৃক বিচারক নির্বাচনের নিয়ম করা হলে তাদের দ্বারা উপযুক্ত বিচারক নিয়োগ মোটেই সম্ভব নয়। তাই দেশের প্রধান শাসক কর্তৃক কোন বিচারক নিয়োগ কমিটির সুপারিশক্রমে বিচারক নিয়োগ করাই উত্তম বলে মনে করা হয়।

০৩. **বিচারকের কার্যকালের স্থায়িত্ব ঃ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বিচারকের ক্ষমতার কার্যকাল স্থায়ী হওয়া উচিত। স্বল্পকালের জন্য নিযুক্ত বিচারকদের পক্ষে তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করার বেশি সম্ভাবনা থাকে। বিচারকদের কার্যকালের স্থায়িত্ব থাকলে তারা তাদের অভিজ্ঞতার সুফলকে কাজে লাগানোর সুযোগ পেলে নির্ভয়ে ও নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য করতে পারেন।

০৪. **বিচারকদের অপসারণ ঃ** বিচারপতিদের অপসারণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আইনসভা কর্তৃক অভিশংসন প্রস্তাব ও বিচার কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশে বিচারকদের অপসারণ করা উচিত।

০৫. **চাকরির নিশ্চয়তা বিধান ঃ** বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তার জন্য যথাযথ সাংবিধানিক আইন বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। অকারণে বা সামান্য কারণে পদচ্যুতির আশংকায় বিচারকগণ ন্যায়বিচার করতে পারেন না।

০৬. **পদোন্নতির ব্যবস্থা ঃ** পদোন্নতির আশা মানুষের কর্মদক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। যথাসময়ে পদোন্নতি না পেয়ে মানুষ হতাশার শিকার হয় এবং দায়িত্ব পালনে অনীহা প্রদর্শন করে। বিচারকদের বেলায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণের অন্যতম শর্ত হলো বিচারকদের যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৭. **উচ্চতর পদমর্যাদা ও বেতন-ভাতা প্রদান ঃ** বিচারকদের উচ্চতর সামাজিক মর্যাদা, বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উপর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। উচ্চতর সামাজিক পদমর্যাদা বিচারকদের দৃঢ়চেতা করে তোলে। উচ্চতর বেতন, ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা তাদের প্রলোভনমুক্ত রাখে।

০৮. **বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ঃ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচার বিভাগকে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে। অধ্যাপক লাস্কির মতে, "স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ অত্যাবশ্যক"। তাছাড়া সাংবিধানিক উপায়ে বিচার বিভাগের প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

০৯. **জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ ঃ** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য জনগণ ও রাজনীতিবিদদের আগ্রহ থাকতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণকে সাংবিধানিক উপায়ে চাপ প্রয়োগ ও আন্দোলন করতে হবে।

১০. **দলীয় প্রভাবমুক্ত ঃ বিচার বিভাগের** স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে বিচারকদের দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকতে হবে। দলীয় প্রভাবে কিংবা ক্ষমতাসীন দলের চাপের মুখে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়। তাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচারকগণ দলীয় প্রভাবমুক্ত থাকবে অথবা কারো চাপের মুখে নতি স্বীকার করবেন না।

১১. **জীবনের নিরাপত্তা ঃ স্বাধীন** ও নিরপেক্ষ বিচারকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে বিচারকের জীবন যদি হুমকির সম্মুখীন হয় কিংবা তার জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তাহলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিচারকের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা সরকারের একান্ত দায়িত্ব।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং বলা যায় যে, প্রয়োজনবোধে বিচারপতিগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে দেশের গণতন্ত্রকে আরো অর্থবহ করে তোলা উচিত।

Scanned by CamScanner

Student Work

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা, গঠন, কার্যপ্রণালী ও এখতিয়ার

বাংলাদেশে বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সর্বোচ্চ বিচার প্রতিষ্ঠান হলো সেসব দেশের সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোট মূলত বিচার বিভাগের অধীন সর্বোচ্চ আদালত। একটি সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গঠিত। সুপ্রিম কোর্টই মূলত সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংবিধানের রিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে আসছে।

গঠন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের ৯৪ ধারায় সুপ্রিম কোর্টের গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট' নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।

প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যে সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজনবোধ করবেন, সে সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হবে।

বিচারক পদে যোগ্যতা : সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ পেতে হলে নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে :

ক. সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট হিসেবে অন্যূন দশ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা।

খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বছর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিংবা অন্যূন দশ বছর অ্যাডভোকেট ছিলেন এবং অন্যূন তিন বছর জেলা বিচারকের ক্ষমতা নির্বাহ করেছেন।

কর্মের মেয়াদ ও শর্তাবলি : সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ সাতষট্টি বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। একজন বিচারপতি যে কোনো সময় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন। শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্য, গুরুতর অসদাচরণ ইত্যাদি বিষয়ে তিনসদস্য বিশিষ্ট সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে কোনো বিচারককে অপসারণ করা যাবে। বিচারক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো লাভজনক পদে বহাল হতে পারবেন না। অবসরগ্রহণ শেষে কোনো আদালতে ওকালতি করতে পারবে না বা প্রজাতন্ত্রের কোনো কর্মে নিয়োগযোগ্য হবেন না।

হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি : ধারা-১০১ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের কার্যাবলির উৎস দুটি। যথা : ক) সাধারণ এখতিয়ার ও খ) সাংবিধানিক এখতিয়ার।

ক. সাধারণ এখতিয়ার : দেশের সাধারণ আইনসমূহ হাইকোর্ট বিভাগকে যে এখতিয়ার দিয়ে থাকে তাকে সাধারণ এখতিয়ার বলে। সাধারণ এখতিয়ার বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এগুলো হলো-

১. **আদি এখতিয়ার :** যা প্রাথমিকভাবে গ্রহণ করা যায়। যেমন কোম্পানি আইন ১৯১৩, এডমিরালটি আইন ১৮৬১, ব্যাংকিং কোম্পানিজ আইন ১৯৬২।

২. **আপিল এখতিয়ার :** ফৌজদারি কার্যবিধি ও দেওয়ানি কার্যবিধি হাইকোর্ট বিভাগকে আপিল এখতিয়ার দিয়েছে।

৩. **রিভিশনাল এখতিয়ার :** এর বলে সুপ্রিম কোর্ট অধস্তন আদালতের রায় পরীক্ষা করতে পারে।

৪. **রেফারেন্স এখতিয়ার :** অধস্তন আদালত কর্তৃক পাঠানো কোনো মামলার আইনগত প্রশ্নে হাইকোর্ট বিভাগ যে পরীক্ষা করতে পারে তা রেফারেন্স এখতিয়ার।

খ. সাংবিধানিক এখতিয়ার : সংবিধানে তিন ধরনের সাংবিধানিক এখতিয়ার রয়েছে। এগুলো হলো : ১. রিট জারির এখতিয়ার; ২. তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণমূলক এখতিয়ার; ৩. মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা।

১. **রিট জারির এখতিয়ার :** অনুচ্ছেদ ১০২-এর এখতিয়ারবলে হাইকোর্ট বিভাগ মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে তা বলবৎ করতে পারে এবং বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনাকে কার্যকর করতে পারে- একে হাইকোর্ট বিভাগের রিট এখতিয়ার বলা হয়।

২. **তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণমূলক এখতিয়ার (অনুচ্ছেদ ১০৯) :** হাইকোর্ট বিভাগ তার অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর এটি করা যাবে :

ক. অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করার নির্দেশ দিতে পারে।

খ. অধস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালের কর্মচারীবৃন্দ কিভাবে খাতাপত্র এবং হিসাব রক্ষা করবে সে বিষয়ে নির্দেশ দান করতে পারে।

গ. এরা আইন অনুযায়ী কাজ করছে কিনা, তাদের দ্বারা আইন সীমালঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, সীমা অনুযায়ী তারা কাজ করছে কিনা তা তদারকি করতে পারবে।

ঘ. অধস্তন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় যে কোনো আদেশ হাইকোর্ট বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

Scanned by CamScanner

৩. **মামলা হস্তান্তরের ক্ষমতা :** হাইকোর্ট বিভাগ কতিপয় শর্তসাপেক্ষে কোনো অধস্তন আদালত থেকে মামলা হস্তান্তর করে নিজের কাছে আনতে পারে।

হাইকোর্ট বিভাগের রিট এখতিয়ার : হাইকোর্ট বিভাগের একটি ক্ষেত্রে আদি এখতিয়ার রয়েছে। সেটি হলো রিট জারির এখতিয়ার। রিট শব্দের অর্থ হলো আদালত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ ঘোষিত বিধান বা আদেশ। বাংলাদেশ সংবিধানে সরাসরি কোনো রিটের কথা উল্লেখ নেই। তবে ১০২ অনুচ্ছেদ বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত রিটগুলো অনুমান করা যায় :

১. বন্দি প্রদর্শন (Writ of Habeas Corpus);
২. পরমাদেশ বা হুকুমজারি রিট (Writ of Mandamus);
৩. প্রতিষেধক বা নিষেধাজ্ঞামূলক রিট (Writ of Prohibition);
৪. উৎপেষণ রিট (Writ of Certiorari);
৫. কারণ দর্শাও রিট (Writ of Que Warrento) ।

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এখতিয়ার : আপিল বিভাগের কোনো আদি এখতিয়ার নেই। অর্থাৎ এখানে প্রথমে কোনো মামলা দায়ের করা যাবে না। হাইকোর্ট বিভাগের মতো আপিল বিভাগের এখতিয়ারের উৎস দুটি। যথা: ১. সংবিধানিক এখতিয়ার ও ২. উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।

সাংবিধানিক এখতিয়ার : (ক) আপিল এখতিয়ার (খ) পরোয়ানা জারি ও নির্বাহের এখতিয়ার (গ) পুনর্বিবেচনার অধিকার বা এখতিয়ার (ঘ) উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার।

ক. **আপিল এখতিয়ার :** আপিল এখতিয়ার শুধু হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। এটা হলো সাংবিধানিক আপিল এখতিয়ার। সাংবিধানিক আপিল এখতিয়ার দুই ভাগে বিভক্ত;

১. যে ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপিল করা যাবে।
২. যে ক্ষেত্রে আপিল বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে আপিল করা যাবে।

হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রি, আদেশ ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে তিনটি ক্ষেত্রে আপিল করা যাবে। যেমন–

(i) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোনো মামলায় সার্টিফিকেট প্রদান করে যে, সংবিধান ব্যাখ্যার ব্যাপারে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে;
(ii) যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করেছে এবং
(iii) যে ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের অবমাননা করেছে এবং তার জন্য হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত ব্যক্তিকে কোন দন্ডদান করেছে।

১০৩ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদ আইন দ্বারা এদের ক্ষেত্র আরো বাড়াতে পারে।

উপর্যুক্ত তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত হাইকোর্ট বিভাগের অন্যান্য সকল রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে কেবল তখনই আপিল করা যাবে যখন আপিল বিভাগ আপিলের অনুমতি দেবে।

খ. **পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ-এর এখতিয়ার (অনুঃ ১০৪) :** আপিল বিভাগের বিচারাধীন যে কোনো বিষয়ের সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য উক্ত বিভাগ যে কোনো আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারে। এটি আপিল বিভাগের একটি স্বেচ্ছাধীন ও অসাধারণ ক্ষমতা।

গ. **পুনর্বিবেচনার অধিকার (অনুঃ ১০৫) :** নিজের ঘোষিত রায়, আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারে। তবে শর্ত ২টি– ১. সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনের বিধানসাপেক্ষে ও ২.আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত কোনো বিধান সাপেক্ষে।

ঘ. **উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার (অনুঃ ১০৬) :** রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপিল বিভাগের পরামর্শ চাইলে। তবে আপিল বিভাগ মতামত দিতে বাধ্য নন, মতামত দিতে অস্বীকার করতে পারেন আবার মতামত দিতেও পারেন এবং প্রদত্ত উপদেশ প্রেসিডেন্ট গ্রহণ করতে বাধ্য নন। এটি বিচার বিভাগীয় রায় নয়।

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশে বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। অধস্তন আদালতগুলো বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপমুক্ত নয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অত্যন্ত সুনামের সাথে স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর বিরুদ্ধে রায়সহ বিভিন্ন রায়ে সুপ্রিম কোর্টের উৎকর্ষ প্রমাণিত হয়। বস্তুত অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ বিচারক এবং অত্যন্ত সচেতন আইনবিদ থাকার কারণে সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে।

Scanned by CamScanner

Student Work

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ঃ বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব-নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকবেন এবং তাকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন [১২৭ (১)]।

মেয়াদ ঃ মহা হিসাব-নিরীক্ষক তার দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে পাঁচ বৎসর বা তাঁহার ৬৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া এর মধ্যে যা আগে ঘটে, সেই কাল পর্যন্তস্বীয় পদে বহাল থাকবেন [১২৯ (১)]।

দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

০১) সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ হবে।

০২) মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্ট দান করবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ, ষ্ট্যাম্প জামিন, ভান্ডার বা অন্য প্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হবেন।

০৩) দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মহা-হিসাব-নিরীক্ষককে অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হবে না।

০৪) রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করবেন, সেরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হবে।

০৫) প্রজাতন্ত্রের হিসাব সম্পর্কিত মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্টসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন।

অপসারণ ঃ সুপ্রীম কোর্টের কোন বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত মহা হিসাব-নিরীক্ষক অপসারিত হবেন না [১২৯ (২)]। মহা হিসাব-নিরীক্ষক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন [১২৯ (৩)]। ১২৯। (৪) কর্মাবসানের পর মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের কর্মে অন্য কোন পদে নিযুক্ত হবার যোগ্য হবেন না। কোন সময়ে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের পদ শূন্য থাকলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে তিনি কার্যভার পালনে অক্ষম বলে রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে ক্ষেত্রমত এই সংবিধানের ১২৭ অনুচ্ছেদের অধীন কোন নিয়োগদান না করা পর্যন্তকিংবা মহা হিসাব-নিরীক্ষক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্তরাষ্ট্রপতি কোন ব্যক্তিকে মহা হিসাব-নিরীক্ষকরূপে কার্য করার জন্য এবং উক্ত পদের দায়িত্বভার পালনের জন্য নিয়োগদান করতে পারবেন।

Student Work

সংশোধনীসমূহ

বিভিন্ন শাসনামলে সাধিত বাংলাদেশের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীসমূহ ঃ

সংবিধান একটি দেশের শাসকদের পথ প্রদর্শক। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে একটি সংবিধান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদে খসড়া সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। ১৯৭২ সনের ১০ জুন সংবিধানের প্রাথমিক খসড়া অনুমোদিত হয় এবং ১১ অক্টোবর খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সনের ১৬ ডিসেম্বর বলবৎ হবার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। এই ১৬টি সংশোধনের মধ্যে ৫ম, ৭ম ও ১৩তম সংশোধনী সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।

প্রথম সংশোধনী ঃ

১২ জুলাই '৭৩ মনোরঞ্জন ধর বিলটি সংসদে পেশ করেন। ১৫ জুলাই '৭৩ বিলটি সংসদে গৃহীত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ই জুলাই এই সংশোধনী আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দী পাকিস্তানী সৈনিকদের বিচারের প্রেক্ষাপটে এই সংশোধনী আইনটি প্রণীত হয়-

(১) এই সংশোধনের ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ; ২ নং দফার পর নিম্নরূপ নতুন দফা যুক্ত হয়-

"এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারিতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সাথে অসামঞ্জস্য বা তার পরিপন্থী এই কারণে বাতিল বা বে-আইনি বলে গণ্য হবে না। এই সংশোধনী আইন প্রণয়নের পর যুদ্ধাপরাধ ও গণ্যহতার অভিযোগে পাকিস্তানী বন্দী সৈনিকদের বিচারের পথ প্রশস্ত হয়।"

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় সংশোধনী ঃ

১৮ সেপ্টেম্বর '৭৩ মনোরঞ্জন ধর সংশোধনী বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন এবং ২০ সেপ্টেম্বর '৭৩ বিলটি সংসদে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় সংশোধনী আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৭৩ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর। এটা ছিল ১৯৭৩ সালের ২৪ নং আইন। এই সংশোধনী আইনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জরুরী বিধানাবলী সংবলিত নতুন নবম ভাগের সংযোজন। জরুরী বিধানাবলীতে ঘোষণা করা হয় যে, যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা এর যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। এরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের প্রয়োজন হবে।

এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা হবে, অথবা সংসদে উপস্থাপিত হবে, অথবা ১২০ দিন অতিবাহিত হবার পূর্বে সংসদের প্রস্তাব দ্বারা অনুমোদিত না হলে তা কার্যকর থাকবে না। জরুরী অবস্থা ঘোষণাকালে মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎকরণের জন্য আদালতে মামলা রুজু করবার অধিকার স্বল্পকালের জন্য স্থগিত থাকবে। তাছাড়া, নাগরিকদের অবাধ চলাফেরার অধিকার, সমবেত হওয়ার অধিকার, সমিতি গঠনের অধিকার, চিন্তা ও বিবেকের অধিকার, ব্যবসা ও কারবার পরিচালনার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও পরিচালনার অধিকার জরুরী অবস্থায় ব্যাহত হবে।

তৃতীয় সংশোধনী ঃ

তৃতীয় সংশোধনী বিলটিও মনোরঞ্জন ধর ২১ নভেম্বর '৭৪ উত্থাপন করেন এবং ২৩ নভেম্বর '৭৪ এ তা সংসদে গৃহীত হয়। এই সংশোধনী আইনটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৭৪ সালের ২৭ নভেম্বর। এটি ছিল ১৯৭৪ সালের ৭৪ নং আইন। বাংলাদেশ সরকার এবং ভারত সরকারের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিতকরণ চুক্তি কার্যকর করবার উদ্দেশ্যে এই সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। মিজোরাম বাংলাদেশ সীমা, ত্রিপুরা সিলেট, ভাগলপুর রেলওয়ে লাইন, শিবপুর গৌরাঙ্গালা সীমা, মুহুরী নদী এলাকা, ফেনী নদী সীমান্ত, হাকার খাল, বৈকারী খাল, হিলি বেরুবাড়ি ও লাঠিটিলা ডুমাবাড়ি সীমান্ত এলাকা সম্পর্কে ১৯৭৪ সালের ১৬ই মে তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে যে চুক্তিটি অনুসারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যবর্তী ভূ-সীমানা নির্ধারণের পর সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে তারিখ বর্ণনা করেন সেই তারিখ হতে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অন্তর্ভুক্ত এলাকা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার অংশ হবে এবং বহির্ভূত এলাকা এর অংশ হবে না।

চতুর্থ সংশোধনী ঃ

২৫ জানুয়ারী মনোরঞ্জন ধর বিলটি সংসদে উপস্থাপন করেন। একই দিনে বিলটি সংসদে পাশ হয়। মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রণীত হয়। এর ফলে বাংলাদেশ সংবিধানের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই সংশোধনী আইন অনুমোদিত হয়। এর পক্ষে ছিল ২৯৪ ভোট এবং বিপক্ষে কোনো ভোট ছিল না। রাষ্ট্রপতি এই সংশোধনী আইনকে দ্বিতীয় বিপ্লব নামে অভিহিত করেন।

চতুর্থ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্য ঃ

১) মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত সরকারের পরিবর্তে বাংলাদেশে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার।
২) মন্ত্রিপরিষদ এর নীতি ও কার্যাবলীর জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ হয়।
৩) সংসদ সদস্য না হয়েও মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হবার সুযোগ প্রদান করা হয়।
৪) রাষ্ট্রপতি নির্বাহী ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। তিনি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন এবং সংসদের কাছে কোনক্রমে দায়ী থাকবেন না। তাঁর ইচ্ছেনুসারে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ কাজ করবেন।
৫) একজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি হয়। উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হবেন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং তাঁরই পরামর্শমতো। রাষ্ট্রপতির খুশিমতো তিনি প্রজাতন্ত্রের কাজে নিয়োজিত থাকবেন।
৬) এই সংশোধনী আইনে বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব কিছুটা হ্রাস পায়। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অপসারণ সার্বিকভাবে রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে।
৭) জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণে যে দায়িত্ব সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত ছিল, এই সংশোধনী আইনে তা বাতিল করা হয়।
৮) এই আইনে বাংলাদেশে একটি জাতীয়দল গঠনের পরিকল্পনা গৃহিত হয়। জাতীয়দল সংগঠিত হলে অন্যান্য দলগুলি বে-আইনি বলে ঘোষিত হয়। এই জাতীয় দলের সংগঠন, এর নামকরণ, নিয়ম শৃঙ্খলার ব্যবস্থা, সদস্যভূক্তি ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির নির্দেশে সম্পন্ন হত।

পঞ্চম সংশোধনী ঃ

পঞ্চম সংশোধনী পাস হয় ১৯৭৯ সালের ৫এপ্রিল সামরিক শাসনের অধীনে গৃহীত সকল পদক্ষেপকে বৈধতা দেওয়া হয়। ২০০৫ সালের ২৯ আগস্ট বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক ও বিচারপতি এ টি এম ফজলে কবীরের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করেন। সংবিধানে পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছিল তা নিম্নরূপ-

Scanned by CamScanner

১) সংবিধানের মূল প্রস্তাবনায় বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম সংযোজন করা হয়। প্রথমে অধ্যাদেশের মাধ্যমে এটি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও পরে রেফারেন্ডামের মাধ্যমে স্থায়ী রূপ দেয়া হয়।
২) সংবিধানের মূলনীতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করা হয়।
৩) সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে সকল কর্মের মূলনীতি হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়।
৪) সমাজতন্ত্র শব্দের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ক ১২ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি সংযোজন করা হয়।
৫) একদলীয় 'বাকশাল' ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়।
৬) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠনের বিধান করা হয়।

ষষ্ঠ সংশোধনী ঃ

এই সংশোধনী আইনটি শাহ আজিজুর রহমান ১ জুলাই ১৯৮১ সংসদে উত্থাপন করেন এবং জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয় ১৯৮১ সালের ৮ই জুলাই। আর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয় ৯ জুলাই। বাংলাদেশ সংবিধনের ৫১ (৪) উপধারায় বর্ণিত আছে যে রাষ্ট্রপতি অথবা উপ রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যভার কালে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন না এবং কোন সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত কিংবা উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলে কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তার আসন শূণ্য হবে। সংশোধনীতে উক্ত ৫১ (৪) উপধারায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে যে, উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলে তিনি যে তারিখে রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করবেন সেই তারিখে তাঁর পদ শূন্য হয়েছে বলে গণ্য হবে"।

৬৬ (২ক) উপধারায় বর্ণিত ছিল যে কোন ব্যক্তি কেবল প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবে না। এই উপধারা সংশোধন করে প্রতিস্থাপিত হয় যে, কেবল রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলে গণ্য হবেন না।"

ষষ্ঠ সংশোধনী আইনে ৫১ ধারায় ৪ উপ-ধারার সাথে আরও দুটি নূতন উপ-ধারা সংযোজিত হয়। ৫ উপধারায় বলা হয়েছে "রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রপতি অথবা উপ-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি সদস্য হবার যোগ্যতা অর্জন করবেন না।" ৬ উপ-ধারায় বলা হয় একজন সংসদ সদস্য যদি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন অথবা উপরাষ্ট্রপতি মনোনীত হন তবে তাঁকে সংগে সংগে সংসদ সদস্য পদ ত্যাগ করতে হবে।

সপ্তম সংশোধনী ঃ

২৬ আগষ্ট ২০১০ হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী এবং বিচারপতি শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় প্রদান করেন। এ রায়ে উল্লেখ করা হয়- "১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলের সকল কর্মকান্ডকে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে বৈধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ শাসন অবৈধ ও সংবিধান পরিপন্থী"।

১৯৮৬ সালের ১০ই নভেম্বর তৃতীয় সংসদের ৬ ঘন্টা স্থায়ী ১ দিনের অধিবেশনে বাংলাদেশ সংবিদানের সপ্তম সংশোধনী আইনটি গৃহীত হয়। বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন এ কে এম নুরুল ইসলাম' ১১ নভেম্বর বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। এই সংশোধনী আইনের লক্ষ্য ছিল, জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন, যে সমস্ত বিধি বিধান ও সামরিক আইন আদেশ জারি করেছেন এবং ঐ সব বিধি বিধানের ভিত্তিতে যে সমস্ত কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে তার বৈধতা দান করা এবং সংবিধানের অন্তর্গত করা। ঐসব কার্যক্রম সম্পর্কে কোন কোর্টে মামলা দায়ের করা চলবে না। এক কথায়, সামরিক শাসনকে বেসামরিকীকরণ করা ছিল এই সংশোধনীর লক্ষ্য।

অষ্টম সংশোধনী ঃ

বাংলাদেশের সংবিধানের (অষ্টম সংশোধনী), আইন, ১৯৮৮ চতুর্থ সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনগুলির মধ্যে বাংলাদেশ সংবিধান (অষ্টম সংশোধনী) আইনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৮৮ সালের ৯ই জুন এই আইনটি প্রণীত হয়। এই আইনের ধারাগুলি নিম্নরূপঃ

১) ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষণাঃ অষ্টম সংশোধনী আইনের ফলে সংবিধানের ২ ধারার পর ২ (ক) ধারা সংযোজিত হবে। ২ (ক) ধারায় বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম ও প্রজাতন্ত্রের শান্তি ও সদ্ভাবের পরিবেশ চর্চা করা হবে।"
২) হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন ঃ এই সংশোধনী আইনে সংবিধানের ১০০ ধারা সংশোধন করে বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩) বিদেশী রাষ্ট্র হতে কোন উপাধি বা ভূষণ গ্রহণ ঃ এই আইনে সংবিধানের ৩০ ধারা সংশোধন করে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশের কোন নাগরিক রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত অন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত কোন উপাধি, সম্মানসূচক ডিগ্রী বা ভূষণ গ্রহণ করতে পারবেন না।
৪) রাজধানীর বানান ও ভাষার নাম ঃ এই সংশোধনী আইনে সংবিধানের ৩ ধারা পরিবর্তন করে ভাষার ইংরেজী প্রতিশব্দ ঠিক করা হয় Bangla (Bengali-এর পরিবর্তে), এবং ৫ ধারা পরিবর্তন করে রাজধানী ঢাকার ইংরেজী নাম স্থির করা হয় Dhaka (Dacca- এর পরিবর্তে)।

Scanned by CamScanner

১১ মে ১৯৮৮ সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আইনটি সংসদে উপস্থাপন করেন সংসদ নেতা জনাব মওদুদ আহমদ। ৭ দিন আলোচনার পর ভোট গৃহীত হয়। এই বিলের পক্ষে ভোট দেন ২৫৪ জন।

নবম সংশোধনী ঃ

চতুর্থ জাতীয় সংসদে মওদুদ আহমেদ ৬ জুলাই ১৯৮৯ বিলটি উত্থাপন করেন এবং ১৯৮৯ সালের ১০ই জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ সংবিধানের নবম সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। ১১ই জুলাই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায়। এই বিল গ্রহণের পক্ষে ২৭২ ভোট এবং এর বিপক্ষে কোন ভোট পড়েনি।

এই সংশোধনীর মূল বক্তব্য নিম্নরূপঃ

১. উপ-রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।
২. রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন এক সংগে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।
৩. একাধিক্রমে দুই মেয়াদ তথা ১০ বৎসরের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না।
৪. ৫ বৎসর পর পর নিয়মিত রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৫. রাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা দেখা দিলে তা নিরসনের জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে সংসদ অধিবেশনে বসবে।

এই আইনে সংবিধানের ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৭২, ১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৮,১৫২ অনুচ্ছেদ এবং সংবিধানের চতুর্থ তফসিল সংশোধিত হয়েছে।

দশম সংশোধনী ঃ

১৯৯০ সালের ১০ই জুন জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে সংবিধানের দশম সংশোধনী আইন, ১৯৯০ উত্থাপিত হয় এবং ১২ জুন তা গৃহীত হয়। ২৩ জুন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। সংসদে এই বিলটি গৃহীত হয় ২২৬ ভোটে। এই সংশোধনী আইনের ধারাগুলি নিম্নরূপ-

১) সংসদে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত ৩০ টি আসন আরও দশ বৎসরের জন্য সংরক্ষিত হয়। সংবিধানে দশ বৎসরের জন্য সংসদে মহিলাদের জন্য ১০ টি আসন নির্দিষ্ট ছিল। ১৯৭৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত সংবিধানের দ্বিতীয় ঘোষণা আদেশে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ১৫ টি আসনের পরিবর্তে ৩০ টি আসন নির্ধারিত হয় এবং তা ১০ বৎসরের পরিবর্তে ১৫ বৎসর কাল সুনির্দিষ্ট হয়। এই সময় উত্তীর্ণ হবার ফলে এই সংশোধনী আইনের প্রয়োজন হয়। দশম সংশোধনী আইনে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত আসন সংখ্যা হয় ৩০ টি এবং এই ব্যবস্থা দশ বৎসর চালু ছিল।

২) সংবিধানের ইংরেজী এবং বাংলা ভাষ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি বিধানে যে অসংগতি বিদ্যমান ছিল এই সংশোধনী আইনে তার নিরসন ঘটলো। এই আইনে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হবার তারিখের ১৮০ দিনের (ছয় মাস) মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন সম্পন্ন হবে।

একাদশ সংশোধনী

২রা জুলাই, ১৯৯১ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন করেন। ৬ আগষ্ট ১৯৯১ এ জাতীয় সংসদে তা গৃহীত হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ পুনরায় প্রধান বিচারপতির পদে ফেরত যেতে পারবেন এবং ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ থেকে অস্থায়ী সরকারের যাবতীয় কার্যকলাপ বৈধ বলে বিবেচিত হবে। ১০ আগষ্ট, ৯১ এ বিলটি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

দ্বাদশ সংশোধনী ঃ

২রা জুলাই, ১৯৯১ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিলটি সংসদে পেশ করেন। ৬ আগষ্ট বিলটি সংসদে গৃহীত হয় এবং ১৮ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি বিলটি অনুমোদন দেন। বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার ফলে বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত হয়।

দ্বাদশ সংশোধনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

১. **সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ** বাংলাদেশের সংবিধান সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর হাতেই প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত। মন্ত্রীগণ জাতীয় সংসদের নিকট ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে দায়ী।
২. **এককেন্দ্রিক শাসন ঃ** সংবিধান বাংলাদেশকে একটি এককেন্দ্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সকল ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই ন্যস্ত।
৩. **মৌলিক অধিকার ঃ** এই সংবিধানে নাগরিকগণকে ব্যক্তিস্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, সাম্যের অদিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। অবশ্য সংসদ এই সকল অধিকারের উপর আইনগত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারবে।

Scanned by CamScanner

৪. **উপাধিসর্বস্ব রাষ্ট্রপতি ঃ** বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের ভোটে ৫ বছরেরর জন্য নির্বাচিত হন। তিনি পর পর ২ বার বা আলাদাভাবে ৫ বছরের জন্য ২ বার নির্বাচিত হতে পারবেন। তিনি উপাধিসর্বস্ব রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে কাজ করবেন।

৫. **আইন সভা ঃ** জাতীয় সংসদ নামে অভিহিত বাংলাদেশের একটি আইনসভা থাকবে। প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদের হাতে থাকবে। জাতীয় সংসদ ৩৩০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ৩০০ জন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। আর একমাত্র মহিলাদের জন্য ৩০ টি আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৬. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ঃ** বাংলাদেশের বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হবে। মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষা করার দায়িত্ব বিচারবিভাগের হাতে ন্যস্ত। সুপ্রীম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়।

৭. **নির্বাচন কমিশন ও কর্মকমিশন ঃ** এই সংবিধানে নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের বিধান করা হয়। সরকারী চাকরিতে লোক নিয়োগের একটি স্বাধীন সরকারী কর্মকমিশনের বিধানও সংবিধানে করা হয়।

৮. **দলীয় শৃংখলা ঃ** বর্তমান সংবিধান সংসদে দলীয় শৃংখলা কঠোরভাবে রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়। এটা সংবিধানের অন্যতম বিশেষত্ব। কোন সংসদ সদস্য নিজের দল ত্যাগ করলে তাকে সংসদের সদস্যপদ হারাতে হবে।

৯. **ন্যায়পাল ঃ** প্রশাসনিক কার্যাবলী বা তাঁকে যে কোন মন্ত্রণালয় বা সরকারী কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করার ক্ষমতা দেয়া যেতে পারে।

১০. **সংবিধানের সার্বভৌমত্ব ঃ** সংবিধানই প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এর পরিপন্থী যে কোন আইন বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১. **সার্বজনীন ভোটাধিকার ঃ** এই সংবিধান অনুযায়ী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক ১৮ বছর উর্ধ্ব বয়স্ক নাগরিককে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়।

১২. **জরুরী বিধান ঃ** বাংলাদেশের সংবিধানে কতগুলি জরুরী অবস্থাকালীন বিধান আছে। জরুরী অবস্থা চলাকালে কতগুলো বিধান এবং মৌলিক অধিকারের বলবৎকরণ স্থগিত রাখা যেতে পারে।

ত্রয়োদশ সংশোধনী ঃ

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে ১০ মে ২০১১ এর রায় ঘোষণা করেন সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের ফুলবেঞ্চ। তত্ত্বাধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলের এ রায় তখন থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হলেও আগামী দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন এ ব্যবস্থার অধীনেই হতে পারে বলে রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত তার রায়ের পর্যবেক্ষণে বলেছেন অবসরপ্রাপ্ত কোনো প্রধান বিচারপতি, প্রধান বিচারপতি কিংবা আপিল বিভাগের অন্য কোনো বিচারপতিকে জড়ানো যাবে না।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য, সহায়তা প্রদান ও সংবিধানের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের কতিপয় বিধানে অধিকতর সংশোধন কল্পে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয় ২১ মার্চ, ১৯৯৬ তারিখে এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক তা পাস হয় ২৭ মার্চ এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ২৮ মার্চ, ১৯৯৬।

ত্রয়োদশ সংশোধনীটি নিম্নরূপ ঃ

১) প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে অনধিক ১০ সদস্য বিশিষ্ট নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।

২) তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বগ্রহণের ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে।

৩) নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা গ্রহণের দিন থেকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হবে।

৪) প্রধান উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রী ও উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা ভোগ করবেন।

৫) সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হবে।

৬) প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টাদের নিয়োগ ও শপথ পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি।

৭) রাষ্ট্রপতি প্রধান উপদেষ্টা বা উপদেষ্টাদের নিয়োগ বাতিল করতে পারবেন।

৮) তত্ত্বাধায়ক সরকার কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না।

৯) নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন কমিশনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

১০) প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগঃ ক) সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা; খ) সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসর প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি অথবা; গ) আপীল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা; ঘ) আপীল বিভাগের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা; ঙ) বিশিষ্ট ও যোগ্য কোন নাগরিক অথবা; চ) যদি উপরে বর্ণিত কোন ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় বা কেউ দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে প্রেসিডেন্ট স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

Scanned by CamScanner

চতুর্দশ সংশোধনী ঃ

২০০৪ সালের ১৭ মার্চ জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত সংবিধানের চর্তুদশ সংশোধনী বিল ২২৬-১ ভোটে পাশ হয়। সংসদে উপস্থিত ২২৭ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বিল পাশের বিরুদ্ধে ভোট দেন।

১) প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণঃ ৪৮ অনুচ্ছেদের স্বার্থে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ সংশোধনী অনুযায়ী কেবল প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকারের কার্যালয় এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমুহে প্রেসিডেন্টের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ছবি বা প্রতিকৃতি প্রদর্শন করতে হবে দেশের সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও মিশনসমূহে।

২) ৪৫ নারী আসনঃ ৬৫ অনুচ্ছেদের ৩ দফা সংশোধন করে পরবর্তী সংসদ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত নারীদের জন্য ৪৫ টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংশোধনী অনুযায়ী দলের আসন সংখ্যার অনুপাতে মহিলা আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। সরকারি দল ছাড়াও বিরোধী দলও আসন সংখ্যা অনুযায়ী মহিলা আসনে প্রার্থী মনোয়ন দিতে পারবে।

৩) বিচারপতি, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও পিএসসি চেয়ারম্যানের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধিঃ ৯৬ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বিচারপতিদের অবসর নেয়ার বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৭ করা হয়েছে। ১২৯ (১) অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে মহাহিসাব নিরীক্ষকের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা করা হয়েছে ৬৫ বছর। আগে ছিল ৬০ বছর। ১৩৯ অনুচ্ছেদের ১ দফায় পরিবর্তন করে সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যানের ও অন্যান্য সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৬২ থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা হয়।

৪) সিইসি'র ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ ১৪৮ (১) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার ৩ দিনের মধ্যে স্পিকার এমপিদের শপথ গ্রহণ না করলে প্রধান নির্বাচন কশিনার (সিইসি) তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এমপিদের শপথ গ্রহণ করাবেন।

৫) অর্থবিলঃ সংবিধানের ৮২ ধারায় একটি শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। এই ধারায় বর্তমানে সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রয়েছে এমন কোন অর্থবিল বা বিল প্রেসিডেন্টের সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাবে না। সংশোধনীতে এমন কোন অর্থবিল বা বিল এর স্থানে 'কোন বিল' লেখা হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সংযোজন করে সংবিধানে চতুর্দশ সংশোধনী বিল ২০০৪ পাশ করা হয়। পাশ করা বিলটিতে নারী আসন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনসহ সাতটি সংশোধনী রয়েছে। সংবিধানের সংশোধনীগুলো হচ্ছে, ৪৮, ৬৫, ৮২, ৯৬, ১২৯, ১৩৯, ১৪৮ অনুচ্ছেদ এবং সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রস্তাবনা সংযুক্তকরণ।

পঞ্চদশ সংশোধনী ঃ

পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর সংবিধান সংশোধনে সুপারিশ করার জন্য ২০১০ সনের ২১ জুলাই ১৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাতে মহাজোটের বাইরে কোনো সদস্য ছিলেন না। ওই কমিটির সদস্যরা নিজেরা ২৭ টি বৈঠক এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে পাঁচটি বৈঠক করেন। এ ছাড়া সংবিধান বিশেষজ্ঞ, সুশীলসমাজ, মহাজোটের শরিক কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও পত্রিকার সম্পাদকদের মতামত নেয়। এরপরই তত্ত্বাধায়ক ব্যবস্থা বাতিলসহ ৫১ দফা সংশোধনীর সুপারিশ করে ৮জুন ২০১১ সংসদে রির্পোট পেশ করেন। তবে সুপারিশে বিভিন্ন মহলের মতামত স্থান পায়নি। ৩০ জুন ২০১১ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে বহুল আলোচিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাস হয়। বিভক্তি ভোটে সংশোধনীর পক্ষে ২৯১ ও বিপক্ষে মাত্র ১টি ভোট পরে। একমাত্র স্বতন্ত্র সদস্য ফজলুল আজিম বিলটির বিপক্ষে ভোট দেন। তবে মহাজোটের ১২ জন অসুস্থতার কারণে যোগ দিতে না পারায় বিলটি পাসের দিন তারা ভোট দিতে পারেন নি। মহাজোটের শরীক হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন, মঈনউদ্দিন খান বাদল, শাহ জিকরুল আহমেদ ও ফজলে হোসেন বাদশা লিখিত আপত্তি উল্লেখ করে ভোট দেন। তারা বিলের বেশ কয়েকটি দফার উপর সংশোধনীর প্রস্তাব দেন। রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনু সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ, রাষ্ট্রধর্ম ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিলোপের সুপারিশ করেন। এ ছাড়া জাতীয়তা ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন।

পঞ্চদশ সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য সংশোধনীগুলো হলঃ ১। প্রস্তাবনা সংশোধন; ২। রাষ্ট্রধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম এবং ধর্মের অপব্যবহার রোধ; ৩। জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি; ৪। জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব; ৫। অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীদের বিরুদ্ধাচরণ; ৬। সংবিধানের মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত বিধানাবলী; ৭। '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতি বহাল; ৮। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন; ৯। জাতীয় জীবনে মহিলাদের অংশগ্রহণ; ১০। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি; ১১। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত; ১২। সংরক্ষিত নারী আসন বৃদ্ধি; ১৩। দালাল আইনের পুনরুজ্জীবন;

Scanned by CamScanner

১৪। নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি; ১৫। পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন; ১৬। অন্তর্বর্তী সরকার ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন; ১৭। ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংযোজন; ১৮। স্বাধীনতার ঘোষণা সংযোজন; ১৯। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন; ২০। সংবিধান সংশোধনে গণভোট বাতিল; ২১। সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ এ চার সংশোধনী বাতিল ২২। বাকশাল গঠন সংক্রান্ত বিধান বিলুপ্ত।

ষোড়শ সংশোধনী ঃ

১৮ আগষ্ট ২০১৪ মন্ত্রিসভায় সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল অনুমোদিত হওয়ার পর ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) বিল-২০১৪ জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক।

বিলটি উত্থাপনের পর তা সর্বসম্মতক্রমে পাস হয়। বিলের পক্ষে ভোট পড়ে ৩২৭ টি; বিপক্ষে কোনে ভোট পড়েনি। ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংবিধানের ষোড়শ সংশোধন বিলে সম্মতি দেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট। এরপর গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে তা আইনে পরিণত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য সংশোধনী ঃ

সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের সংশোধনা ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদের দফা (২), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭)ও (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২), (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত হবে, যথা-

(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাবে না।

(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

(৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করতে পারবেন।"

সংশোধনীসমূহে জনকল্যাণ ও জাতীয় ঐকমত্যের প্রতিফল বিষয়ে মতামত ঃ

যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। আর এ লক্ষেই ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়। এ সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, "একটি জাতি হিসেবে বাঙালি ইতিহাসে এ প্রথমবারের মত তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সংবিধান প্রণয়ন করবে।"

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টের পর রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে পরিবর্তন সাধিত হয়। তাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত সম্বন্ধে ভীতি ও বিদ্বেষ উভয়ই ক্রিয়াশীল ছিল। তাছাড়া অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা দখলকারী সামরিক নেতৃত্বের জন্য এক ধরনের বৈধতা অর্জন ও জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সমর্থন বলয় সৃষ্টির মানসিকতাও এ ধরনের পরিবর্তনে পরিলক্ষিত হয়। মূলত বলা যায়, রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির পরিবর্তন মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্ট বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানার শামিল।

তবে যে সংশোধনী সম্পর্কে জনগণের মাঝে প্রথম ব্যাপক সাড়া জাগে সেটা হল চতুর্থ সংশোধনী। বাংলাদেশের মত একটা উন্নয়নশীল মডেলের প্রাসঙ্গিকতায় এর বড় একটা প্রয়োজন নেই। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের অধিকার খর্ব করা হয়েছিল। যেখানে পূর্ববর্তী কেবিনেট ব্যবস্থার বিপরীতে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয়, যার কাজ হবে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কার্যাবলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাহায্য ও পরামর্শ দেওয়া। মূলত জাতীয় ঐকমত্যের প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে এ সংশোধনী গৃহীত হয়েছিল, যা জনগণ মেনে নেয় নি এবং এর বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষ করে বামপন্থি দলগুলো বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, সংবিধান একটি রাষ্ট্র তথা জাতির রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। ১৯৭২ সালের সংবিধান তৃতীয় বিশ্ব তথা উন্নত বিশ্বের কাছে একটি Model হিসেবে পরিগণিত। তবে এর সংশোধিত রূপ সম্পর্কে বিশ্বে বিশেষ জনমত সৃষ্টি হয়। ২০০৯ সাল পর্যন্ত ১৪ বার সংশোধনীর মাধ্যমে মূলত এ সংবিধানের আদর্শের প্রতি কিছু অবমাননা করা হয়েছে।

এ পর্যন্ত গৃহীত ১৬টি সংশোধনীর অন্তর্ভূক্ত অধিকাংশ বিষয়ই জনকল্যাণের সাথে বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংশ্লিষ্ট নয়। তাই ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ফেরত যাওয়াটাই শ্রেয়।

১৯৭২ সনের মূল সংবিধানে ফিরে যাবার বিপক্ষে যাদের অবস্থান তাদের মূল বক্তব্য হল এতে করে রাষ্ট্র পরিচালনার অতীত ধারাবাহিকতা ব্যহত হবে। এক্ষেত্রে যে মৌলিক বিষয়গুলো ধারাবাহিতা ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং যে বিষয়গুলো জনগণের কল্যাণে বা রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন সে বিষয়গুলো বিশেষ ব্যবস্থায় সংবিধানে অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে মূল সংবিধান ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়, এ পর্যন্ত তাতে ১৫ বার সংশোধনী আনা হয়। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারই সংবিধানে সর্বোচ্চ ৬টি সংশোধনী এনেছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগ ৫টি ও জাতীয় পার্টির সরকার ৪টি সংশোধনী এনেছে। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ২৫ মার্চ। এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে স্থায়ী সাংবিধানিক ভিত্তি দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধান ১৬ বার সংশোধিত হলেও অধিকাংশগুলোতেই জনগণের স্বার্থে কিছু করা হয়নি। শাসকশ্রেণীর সুবিধার্থে সংশোধনীগুলো করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন জনস্বার্থ প্রতিফলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Scanned by CamScanner

Student Work

সংবিধান বিষয়ক সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

ভোটার হবার যোগ্যতা

সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২২ অনুযায়ি কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হবার অধিকারী হবেন, যদি-

ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;
খ) তার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;
গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষণা বহাল না রেখে থাকে;
ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং
ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হয়ে থাকেন।

সরকারি কর্মকর্তার সাংবিধানিক রক্ষাকবচ

১) সংবিধানের দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হয়ে থাকলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

২) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অপেক্ষা অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনতি হবে না।

৩) সরকারি পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনতি করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেখানে কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত হয়েছেন, সেই আচরণের জন্য তাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনতি করা হয়েছে; অথবা কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনতি করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে-যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করবেন উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে; অথবা রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগদান সমীচীন নয়। অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে কারণ দর্শাবার সুযোগ দান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কিনা, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সেই সম্পর্কে তাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনতি করার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি

বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তবর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদাতা, ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাবে।

চুক্তি ও দলিল

প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলে প্রকাশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করবেন, তার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও প্রণালীতে তা সম্পাদিত হবে [১৪৫। (১)]। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না [১৪৫। (২)]। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে, এবং রাষ্ট্রপতি তা সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে [১৪৫ (ক)]।

Scanned by CamScanner

সংবিধানের মাধ্যমে রহিত রাষ্ট্রপতির আদেশসমূহ

রাষ্ট্রপতির নিম্নলিখিত আদেশসমূহ এতদ্বারা রহিত করা হয়েছে ঃ

ক) আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে প্রণীত);
খ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ;
গ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ৫)
ঘ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ১৫)
ঙ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ২২)
চ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ২৫)
ছ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সরকারী কর্ম সম্পাদন) আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ৩৪)
জ) ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ (সরকারী কর্ম সম্পাদন) আদেশ (১৯৭২ সালের পি, ও, নং ৫৮)

সাংবিধানিক সংস্থা

সংবিধানে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিধি মোতাবেক গঠিত প্রতিষ্ঠানকে সাংবিধানিক সংস্থা বলে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক সংস্থাগুলো হচ্ছে –

১) **জাতিয় সংসদ ঃ** এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের ৫ম ভাগে ৬৫নং অনুচ্ছেদে।
২) **সুপ্রীম কোর্ট ঃ** এ সংক্রান্ত বিধান রয়েছে সংবিধানের ৯৪নং অনুচ্ছেদে।
৩) **নির্বাচন কমিশন ঃ** এ সংক্রান্তবিধান রয়েছে সংবিধানে সপ্তম ভাগের ১১৮-১২৬ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
৪) **মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ঃ** এ সংক্রান্তবিধান রয়েছে সংবিধানের অষ্টম ভাগের ১২৭ থেকে ১৩২ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
৫) **সরকারি কর্ম-কমিশন ঃ** বাংলাদেশে সংবিধানের নবম ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ১৩৭ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্তরয়েছে সরকারি কর্ম-কমিশন সংক্রান্তবিধানাবলী।
৬) **অ্যাটর্নি জেনারেল ঃ** সংবিধানের চতুর্থ ভাগের পঞ্চম পরিচ্ছেদের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল সংক্রান্ত বিধান।

পদের শপথ

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে 'পদের শপথ' সম্পর্কে বলা হয়েছে –

১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল অনুযায়ী শপথ বা ঘোষণা (অনুচ্ছেদে 'শপথ' বলে অভিহিত) করবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করবেন।
২) এ সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ আবশ্যক হলে অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করবেন, সেরূপ ব্যক্তির 'নিকট' সেরূপ স্থানে শপথ গ্রহণ করা যাবে।
৩) এ সংবিধানের অধীনে যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে শপথ গ্রহণ আবশ্যক, সেক্ষেত্রে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করেছেন বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন

রাষ্ট্রপতির অভিশংসন এর ব্যাপারে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ঃ

০১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাতে পারবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করবেন।
০২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন।
০৩) অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকবার এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকবে।
০৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

Scanned by CamScanner

হেবিয়াস কার্পাস

হেবিয়াস কার্পাস হচ্ছে বাদীকে সশরীরে আদালতে হাজির করা এবং আদালতে বন্দিত্বের কারণ প্রদর্শনের নির্দেশপত্র। এ কারণ বিবেচনাপূর্বক আদালত তদন্ত করবে যে, বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হবে কিনা। হেবিয়াস কার্পাসের জন্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রিট (writ) করতে পারে। হাইকোর্টকে হেবিয়াস কার্পাসের রিটের ব্যাপারে নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার প্রভৃতি নিশ্চিত করতে হবে।

অ্যামিকাস কিউরি

Amicus curiae শব্দটি ল্যাটিন ভাষার। একবচনে Amicus, বহুবচনে Amici। 'এমিকাস কিউরি' অর্থ 'আদালতের বন্ধু'। ১৯ আগস্ট ২০০৯ সুপ্রিম কোর্ট আদালতকে আইনি সহায়তা দিতে সুপ্রিম কোর্টের ১০ জন সিনিয়র আইনজীবীকে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ দেয়। তখন থেকেই প্রত্যয়টি আলোচিত হয়ে আসছে। অ্যামিকাস কিউরি বলতে একজন ব্যক্তি অথবা একটি সংগঠনকে বোঝায়, যিনি অথবা যারা মামলার কোনো পক্ষ নন, কিন্তু আদলতের অনুমতি সাপেক্ষে তথ্য অথবা পরামর্শ দানের মাধ্যমে আদালতের কাজে সহায়তা করেন।

রাষ্ট্রপতির রেফারেন্স

সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এরূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করতে পারবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করতে পারবেন।'

কোর্ট মার্শাল

সেনা আইনে চার প্রকারের কোর্টের বিধান রয়েছে, যথা-সামারি কোর্ট মার্শাল, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট মার্শাল, ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল এবং জেনারেল কোর্ট মার্শাল। অপরাধের গুরুত্ব ও শাস্তি প্রদানের এখতিয়ারের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন কোর্টে সংঘটিত অপরাধের বিচার করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শুধুমাত্র ফিল্ড জেনারেল এবং জেনারেল কোর্ট মার্শালে বিভিন্ন মেয়াদের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড পর্যন্তশাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল ন্যূনতম তিন সদস্যের সমন্বয়ে এবং জেনারেল কোর্ট মার্শাল ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে।

অধ্যাদেশ

যখন সংসদ অধিবেশন থাকে না অথবা সংসদ যখন বিলুপ্ত, তখন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রপতি যে আইন প্রণয়ন ও জারি করেন তাকে অধ্যাদেশ বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩ (১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি দু' অবস্থায় অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। প্রথমত সংসদের অধিবেশন না থাকলে কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তিনি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, সংসদ ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন। কোনো অধ্যাদেশ জারির পর যদি তা ইতঃপূর্বে বাতিল না হয় তাহলে সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে সেটি উপস্থাপিত হতে হবে এবং উপস্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে সংসদ অনুমোদন না দিলে অধ্যাদেশটি আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে। অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত অবশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে। সেগুলো হলো –

এই দফার অধীনে কোনো অধ্যাদেশের –

ক) এমন কোনো বিধান করা হবে না যা সংসদের আইন দ্বারা আইনসঙ্গত করা যায় না।

খ) সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হয়ে যায় এমন কোনো অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা যাবে না।

গ) পূর্বে প্রণীত কোনো অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায় এমন কোনো অধ্যাদেশ করা যাবে না।

সংবিধান কর্তৃক উপরিউক্ত তিনটি শর্ত সাপেক্ষে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারির ক্ষমতা দেয়ায় যে কোনো অধ্যাদেশের বৈধতার প্রশ্ন তুলে তার সিদ্ধান্তের জন্য আদালতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা নেই।

রাষ্ট্রপতির অপসারণ

সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে সংসদ সদস্যের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অভিযোগের বিবরণ সম্বলিত একটি প্রস্তাব স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হয়। স্পীকার সংবিধানে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রপতি অভিশংসনের প্রস্তাবটি সংসদে প্রেরণ করবেন। অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন্য দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হবার তারিখ হতে রাষ্ট্রপতি অভিশংসিত হবেন বা রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

Scanned by CamScanner

মন্ত্রিসভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ২য় পরিচ্ছেদের ৫৫নং অনুচ্ছেদে 'মন্ত্রিসভা' শিরোনামে (১) থেকে (৬) নং দফায় নিম্নরূপ বলা হয়েছে –

ক) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে।

খ) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রিসভার উপর প্রযুক্ত হবে।

গ) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন।

ঘ) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে।

ঙ) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে, রাষ্ট্রপতি তা বিধিসমূহ দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলে তার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।

চ) রাষ্ট্রপতি সরকারি কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।

রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৬ নং অনুচ্ছেদে 'দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য কোনো ব্যক্তি জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোনো অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোনো কাজ করে থাকলে সংসদ আইনের দ্বারা সে ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কাজকে বৈধ করে নিতে পারবেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি'-র নীতিতে বলা হয়েছে–

১) এ সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তাঁর গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত থেকে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

এটর্নি জেনারেল

অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যাবলী :

অধিকাংশ সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন সরকারের প্রধান আইন উপদেষ্টা। আবার কিছু কিছু বিচারব্যবস্থায় আইন প্রয়োগে জবাবদিহিতার বিষয়ে তিনি নির্বাহীর দায়িত্বে থাকেন অথবা কোনো সাধারণ বিষয়ের আইনগতভাবে তিনি দায়িত্বশীল হিসেবে অথবা প্রসিকিউটর হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় অ্যাটর্নি জেনারেল একটি সাংবিধানিক পদ। সংবিধানের ৬৪ নং অনুচ্ছেদে এই পদের পরিচয় ও কার্যাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা নিম্নরূপ :

অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং এর কার্যাবলী :

বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪ (১, ২, ৩ ও ৪) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

১. সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন।

২. অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশর সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে।

৪. রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।

এছাড়া পদাধিকার বলে অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সভাপতি হন। সংবিধানের ১০৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রীম কোর্টের নিকট রেফারেন্স হিসেবে উপস্থিত হয়ে নিজস্ব মতামত পেশ করতে পারেন। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস সকল আইনগত বিষয় নিয়ে কাজ করে এবং সরকারের আইনি পরামর্শক হিসেবে আদালতের সামনে সরকারের পক্ষে ওকালতি করে। এ বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল উচ্চ পেশাগত পরিচয় বহন করেন। বর্তমানে অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসের পদগুলো হলো অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এবং সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল।

Scanned by CamScanner

বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের গঠন :

বাংলাদেশের বিচার বিভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের সর্বোচ্চ বিচার প্রতিষ্ঠান হলো সেসব দেশের সুপ্রিম কোর্ট। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত। সুপ্রিম কোর্টই মূলত সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে কাজ করে। নিচে এই আদালতের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা : বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪নং অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্ট গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তা নিচে আলোচিত হলো:

১. 'বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট' নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে।
২. প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যে সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সে সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে।
৩. প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করবেন।
৪. এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকবেন।

বিচারক নিয়োগ : বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী-

(১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করবেন।
(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হলে, এবং
   ক. সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল অ্যাডভোকেট না থেকে থাকলে; অথবা
   খ. বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসরকাল কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করে থাকলে; অথবা
   গ. সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকলে তিনি বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্য হবেন না।
(৩) এই অনুচ্ছেদে 'সুপ্রীম কোর্ট' বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসেবে এখতিয়ার প্রয়োগ করেছে, সেই আদালত অন্তর্ভূক্ত হবে।

সংসদীয় সরকারের গঠন প্রক্রিয়া :

পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত দু'ধরনের সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তন্মধ্যে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা সর্বাধিক জনপ্রিয়। বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য, অষ্ট্রেলিয়াসহ পৃথিবীর নানা দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর পরই সংসদীয় সরকারের প্রবর্তন হয়েছিল। মাঝপথে কয়েকবার হোচট খেলেও ১৯৯১ সালে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটে আজ পর্যন্ত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থা বা প্রধানমন্ত্রী নির্ভর সরকার ব্যবস্থাও বলা হয়।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন : রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আইন পরিষদের নিকট দায়ী নন। কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হলেন নামমাত্র প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী হলেন নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান। নিচে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো:

১. **প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। আর মন্ত্রিপরিষদ হলো সরকার ব্যবস্থার অংশ। প্রধানমন্ত্রী নির্ধারণ করবেন কে তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হবেন এবং কার দায়িত্ব কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন সংসদের অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে। প্রধানমন্ত্রী সহ তার মন্ত্রিপরিষদ যে কোনো বিষয়ের জন্য সংসদ বা পার্লামেন্টের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। সংসদ সদস্যরা হবেন দেশের সকল অঞ্চলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি।

২. **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা নামমাত্র। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি তার নামে চললেও কার্যত তিনি ক্ষমতাশূন্য। কোনো কোনো দেশে রাজা বা রাণী হলেন রাষ্ট্রপতির মতো। সংসদের আইন প্রণেতারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে থাকেন। সংসদীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত পার্লামেন্টের ভেতরে সদস্যদের ভোটে সংঘটিত হয়।

৩. **আইন পরিষদ গঠন :** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইন পরিষদ কার্যকর থাকে। আইন পরিষদের সদস্যরা হলেন দেশের জনপ্রিতিনিধি ও আইনপ্রণেতা। দেশের জন্য আইন প্রণয়ন, মন্ত্রিপরিষদের জবাবদিহিতা, যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংসদে আলোচনা, প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা, রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ও অপসারণ প্রভৃতি বিষয়ে আইন পরিষদের ভূমিকা সর্বাধিক।

৪. **বিরোধী দলের উপস্থিতি :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দলের স্বীকৃতি দেয়া হয়। সংসদে বিরোধী দল সরকারি যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে, সরকারের সমালোচনা করতে পারে, সরকারের ভুল দেখিয়ে দিতে পারে এবং দেশের স্বার্থে তাদের নিজস্ব মতামত দিতে পারে। সংসদীয় পদ্ধতিতে বিরোধী দলকে ছায়া সরকার বলা হয়। সুতরাং সংসদে বিরোধী দলের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে সরকারি দলের জবাবদিহিতা বাড়ায়।

Scanned by CamScanner

৫. **রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান দুজন ব্যক্তি :** সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এই ব্যবস্থায় একই ব্যক্তি একই সাথে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান হতে পারেন না। রাষ্ট্রপ্রধান হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক, যিনি প্রেসিডেন্ট বা সমতুল্য অন্য কোনো পদবিতে ভূষিত হবেন। অন্যদিকে সরকার প্রধান হলেন নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় আইন পরিষদ নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

বাংলাদেশের আইন পরিষদের গঠন :

বাংলাদেশের আইন পরিষদের নাম জাতীয় সংসদ। প্রজাতন্ত্রের সব আইন প্রণয়নের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত। ১৯৭২ সালের সংবিধানে জাতীয় সংসদ ছিল রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উৎস। পরবর্তীতে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আইনে সংসদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদ আবারো ফিরে পেয়েছে তার পূর্ব গৌরব।

১৯৭২ সালের মুল সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদ ৩১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো। এর মধ্যে ৩০০ জন প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের ভোটে, বাকি ১৫ জন সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে সংরক্ষিত নারী আসন ৩০ করা হয়। এ ৩০ জন নারী সদস্য সংসদ সদস্যের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য সংসদ সদস্যদের ভোটে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের বিধান সম্বলিত আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় অষ্টম জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ছিল ৩০০। তবে চতুর্দশ সংশোধনীতে নারীদের জন্য ৪৫টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। নবম জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যানুপাতে এ আসন বন্টিত হবে। এ আসন সংরক্ষণের মেয়াদ হবে ১০ বছর। ফলে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বর্তমানে ৩৫০। প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা বা নেত্রী হিসেবে গণ্য হন। জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ বছর। অবশ্য এ কার্যকালের পূর্বেও রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতে পারেন।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পরিচালনায় Rules of Procedure-এর গুরুত্ব :

একটি দেশ পরিচালনার জন্য যেমন সংবিধানের প্রয়োজন হয়, তেমনি একটি দেশের পার্লামেন্ট পরিচালনার জন্য কার্যপ্রণালি বিধি থাকতে হয়। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট হলো জাতীয় সংসদ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদের (১) দফার (ক) উপ-দফায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১ এপ্রিল ১৯৭৩ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধি প্রথম প্রণয়ন করেন। এরপর সর্বশেষ ২০০৬ সালে সংশোধিত হলে মোট ১০ বার এর সংশোধনী হয়। জাতীয় সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে এই বিধির প্রয়োজনীয়তা অসীম।

Rules of Procedure বা কার্যপ্রণালি বিধির গুরুত্ব : জাতীয় সংসদ হলো বাংলাদেশের আইন পরিষদ বা পার্লামেন্ট। এখান থেকে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সকল নীতি তৈরী হয়। সংসদ সদস্যগণ হলেন আইনপ্রণেতা। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল জনপ্রতিনিধি এই পরিষদের সদস্য। বর্তমানে জাতীয় সংসদের সদস্যসংখ্যা হলো ৩৫০ জন। একজন স্পিকারের সভাপতিত্বে সদসদের নিয়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাকক্ষে সাংসদদের ভূমিকা ও সংসদীয় আচরণ কিরূপ হবে সে সম্পর্কিত বিধিমালাই হলো সংসদের Rules of Procedure বা কার্যাপ্রণালী বিধি, যার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. সংসদ আহ্বান, স্থগিতকরণ কিংবা ভঙ্গের বিধি বর্ণনা করা হয়েছে এতে। পাশাপাশি সদস্যবৃন্দের আসন-ব্যবস্থা, শপথ গ্রহণের নিয়ম-কানুন রয়েছে এতে।
২. প্রথম বৈঠকে স্পিকারের নির্বাচনের জন্য অগ্রসর হবেন।
৩. Rules of Procedure-এর অন্যতম বিধি হলো সদস্যবৃন্দ কর্তৃক পালনীয় বিধি। এতে উল্লেখযোগ্য কিছু নিয়ম হলো সদস্যদের সংসদে প্রবেশ করার সময় বা সংসদ কক্ষ ত্যাগ করার সময় সভাপতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। সভাপতি ও বক্তৃতারত কোনো সদস্যের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাচল করবেন না। স্পিকার কর্তৃক সংসদে ভাষণ দানকালে সংসদ কক্ষ ত্যাগ করবেন না। সংসদের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো বই, সংবাদপত্র বা চিঠিপত্র পাঠ করবেন না প্রভৃতি।
৪. সংসদের সভাকক্ষে ৬০ জনের কম সদস্যের উপস্থিতি হলে স্পিকার সভা মুলতবি করবেন কিংবা ৫ মিনিট ঘন্টা বাজানোর পরেও যদি কোরাম পূর্ণ না হয় তাহলে সভা মুলতবি ঘোষণা করবেন।
৫. মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব সরকারি কার্যাবলি বলে গণ্য হবে।
৬. সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাব বেসরকারি কার্যাবলি বলে গণ্য হবে।
৭. বৃহস্পতিবারে বেসরকারি সদস্যদের কার্যাবলি প্রাধান্য পাবে। অন্যান্য দিনে সরকারি কার্য ব্যতীত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন করা হবে না।
৮. প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম ১ ঘন্টা প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে। তবে প্রতি বুধবারে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট প্রশ্নোত্তর পর্ব থাকবে প্রধানমন্ত্রীর জন্য। তবে বাজেটের দিন কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।

Scanned by CamScanner

৯. তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন হলো মৌখিক উত্তরের জন্য যে প্রশ্ন এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্ন হলো লিখিত উত্তরের জন্য যে প্রশ্ন। সম্পূরক প্রশ্ন হলো তারকা চিহ্নিত পশ্নের উত্তরদানের পর প্রথমে প্রশ্নকারী ১টি এবং পরে যে কোনো সদস্য উত্তর দিতে পারেন।

১০. অর্থ বিল হলো পরবর্তী বছরের আর্থিক প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যে বিল উত্থাপন করা হয়।

১১. সংসদের অনুমতি ব্যতীত একাধারে ৯০ দিনের বেশি কোনা সদস্য অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।

১২. কোনো কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নিয়ে কোরাম গঠিত হবে প্রভৃতি।

উপরিউক্ত ধারাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায়, Rules of Procedur সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। আর যে কোনো দেশ সামনে এগিয়ে চলে সংসদ বা পার্লামেন্টকে কার্যকর করার মধ্য দিয়ে।

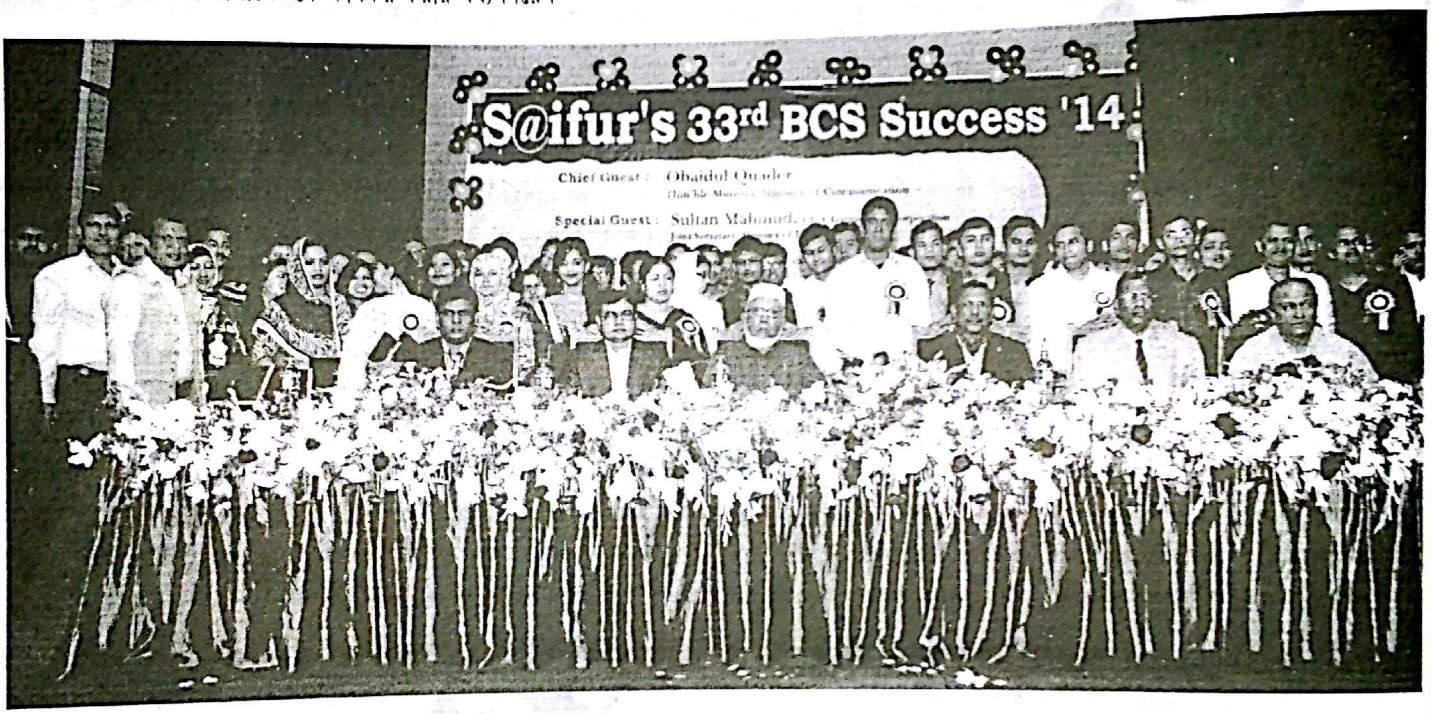

S@ifur's ৩১তম BCS ক্যাডার সংবর্ধনা।

Scanned by CamScanner